

হরর ক্লাব
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন
টিপু কিবরিয়া



কিশোর হরর-১৭

[হরর ক্লাব]

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

টিপু কিবরিয়া



সেবা প্রকাশনী



সাতাশ টাকা

ISBN 984-16-1359-8

প্রকাশক

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সবস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: টিপু কিবরিয়া

মুদ্রাকর

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেগুনবাগান প্রেস

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

দূরালাপন: ৮৩ ৪১ ৮৪

জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক

প্রজাপতি প্রকাশন

২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম

সেবা প্রকাশনী

৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন

৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

BHOYANOK DUSSWAPNO

A Horror Novel

by: Tipu Kibria



আমার নাম জ্যোতি ।

হ্যাঁ, 'জীবন্ত মমি' আর 'পিরামিডের আতঙ্কের' জ্যোতি ।

সেই যে মিশরের গ্রেট পিরামিড চেম্বারে—

না থাক, সে কাহিনী তো তোমরা জানো ।

তোমাদের জন্যে একটা সুখবর আছে, দারুণ খবর!

আমরা একটা ক্লাব খুলেছি ।

নাম কি জানো? হরর ক্লাব ।

আমি জানি, আমাদের ক্লাবের অন্য সদস্যদের নাম শুনে

তোমরা আরও খুশি হয়ে উঠবে ।

কারণ ওরা তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত—

'অতৃপ্ত প্রেতাশ্রম' তিয়ানা, 'বৃক্ষমানবের' উর্মি,

'জাদুর ঘড়ির' রাজা, 'নেকড়েমানবের' উপম,

'অদৃশ্য বন্ধুর' ইমরান আর 'পাশের বাড়ির ভূতের' সৌরভ ।

আমাদের উদ্দেশ্য কি জানো?

অলৌকিক, অবিশ্বাস্য, রোমহর্ষক আর ভীতিকর

সব ঘটনার সন্ধান করা ।

অদ্ভুত হলেও সত্যি, এমন ঘটনাগুলোই

এসে হাজির হয় আমাদের সামনে ।

ভয় পেতে যে ভালবাস, চলো আমাদের সাথে,

হরর ক্লাবে তোমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ।

এক

‘ধ্যাতেরি!’ বলল জ্যোতি। চোখেমুখে চরম বিরক্তি। ছবি দেখবে বলে বসেছিল। কিন্তু কোনটাই ভাল লাগছে না। ভিউ সিডিতে একটার পর একটা ডিস্ক ভরছে ও। বড়জোর পাঁচ মিনিট দেখছে, তারপরই ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। ভাল লাগছে না। এর চেয়ে বোধহয় মা-বাবার সাথে যাওয়াই উচিত ছিল।

মার এক বান্ধবীর মেয়ের জন্মদিন আজ। ধানমণ্ডিতে ওদের বাসা। মা-বাবা গেছেন অতিকে নিয়ে। ওকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু জ্যোতি থেকে গেছে জোর করে। পিচ্চিদের হাউকাউ ভাল লাগে না।

এখন বরং উল্টোটা মনে হচ্ছে জ্যোতির। যাওয়াই উচিত ছিল। একা একা বসে থাকার চেয়ে সেটাই ভাল হত। কিন্তু এখন আর আফসোস করে লাভ নেই। যা হবার হয়ে গেছে।

আসলে মহল্লার ভিডিয়ো ক্যাসেট ডিস্কের পরিচিত দোকানটা ওকে ডুবিয়েছে। আজ জ্যোতিকে নতুন এক হরর ছবি এনে দেয়ার কথা ছিল ওদের, সেই আশায় থেকে গিয়েছিল। কিন্তু আনেনি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

ব্যাটারা, ভুলে গেছে নাকি। এর কোন অর্থ হয়? ব্যাটারদের জন্যে অনর্থক সুন্দর একটা বিকেল মাটি হলো জ্যোতির।

এমনিতেই স্কুল ছুটি বলে নিরামিষ দিন কাটছে। অভিযান প্রিয় মন হাঁপিয়ে উঠেছে ওর বাসায় বসে থেকে থেকে। গরমের লম্বা ছুটি। আর ভাল লাগে না।

রিমোট কন্ট্রলের সুইচ টিপে ভিউ সিডি অফ করল জ্যোতি, তারপর টিভি। আরেকবার ‘ধ্যাতেরি!’ বলে উঠে পড়ল। সামনের রাস্তায় গিয়ে বরং একটু হাঁটাহাঁটি করা যাক। পরিচিত কাউকে পেলেন কথা বলা যাবে।

স্যাভেলে পা গলাতে গিয়ে থেমে গেল ও কলিংবেলের শব্দে। একটানা বেজে চলেছে।

‘কে?’ হাঁক ছাড়ল জ্যোতি।

জবাব নেই। বেজেই চলেছে বেল।

কি মুশকিল! এক পায়ে স্যাভেল পরা অবস্থায় ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ছুটল ও ব্যস্ত হয়ে। বেলের আওয়াজ বাজে লাগছে, স্যাভেল পরার চেয়ে ওটা থামানো জরুরী।

‘কে! আরে আসছি তো!’ পড়িমরি করে ছুটে গিয়ে দরজা খুলল ও। পরক্ষণে মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল উপমকে দেখে। হাঁসছে দাঁত বের করে। ‘অ্যাই ব্যাটা! এইভাবে কেউ বেল বাজায়?’

‘আর কেউ বাজায় কিনা জানি না,’ বলল উপম, ‘তবে উপম বাজায়। বিশেষ প্রয়োজন পড়লে অবশ্য।’ দু’হাত দেহের পেছনে।

‘চোপ, রামছাগল!’ ধমকে উঠল জ্যোতি। ‘মা-বাবা বাসায়—’

বিজ্ঞের মত মাথা দুলিয়ে হাসল উপম। ‘খালা-খালু বাসায় নেই

আমি জানি। ওঁদের বাইরে যেতে দেখেছি আমি, বুঝলি, ব্যাটা রামপাগল? এবার সরে দাঁড়া সামনে থেকে, ঢুকতে দে। আর দামী কি দিয়ে মেহমানদারী করা যায়, তাড়াতাড়ি সেই ব্যবস্থা কর। ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেছে।’

বিস্মিত হলো জ্যোতি। উপমের কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তায় উঁকি দিল। ‘কই, কোথায় মেহমান?’

নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠেকাল উপম। ‘এই যে।’

জ্যোতি চোখ কৌচকাল। ‘বিটলামী হচ্ছে? মারব কষে এক চড়!’

‘কি? এইভাবে মেহমানকে অপমান? ঠিক আছে, চললাম তাহলে। খবরটা আর দেয়া হলো না।’ হাত সামনে নিয়ে এল উপম। ওর ডান হাতে ধরা একটা চিঠি দেখল জ্যোতি। ধীরেসুস্থে ভাঁজ করে পকেটে ভরার আয়োজন করছে সে।

‘ওটা কি রে, উপম? চিঠি?’

‘হ্যাঁ,’ স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ও। পকেটে ভরে ফেলল ওটা।

‘কিসের? কে লিখেছে?’ অবৈধ হয়ে উঠল জ্যোতি।

‘এটা? আমাকে এক জায়গায় বেড়াতে যাওয়ার—’

লাফিয়ে উঠল জ্যোতি। ‘বেড়াতে! কোথায়?’

‘সেন্ট মার্টিন,’ বলে ঘুরে দাঁড়াল উপম।

পেছন থেকে থাবা দিয়ে ওর কলার চেপে ধরল জ্যোতি।

‘দাঁড়া, যাচ্ছিস কোথায়? কে লিখেছে ওটা? কার আমন্ত্রণ?’

‘আমার চাচার।’

চোখ বড় হয়ে উঠল জ্যোতির। ‘অ্যা! মানে তোর সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

মেরিন—

‘হ্যাঁ। আমার সেই বিখ্যাত মেরিন বায়োলজিস্ট চাচা নেয়ামুল ইসলাম। নিজের ভাসমান ল্যাবরেটরি নিয়ে এখন সেন্ট মার্টিন দ্বীপে আছেন।’

‘তাকে যেতে বলেছেন?’ আনন্দে দম আটকে আসার জোগাড় হলো প্রধানের। ‘সত্যি বলছিস?’

‘শুধু আমাকে নয়। দুই-একজন বন্ধুকেও নিয়ে যেতে বলেছেন।’

‘বলিস কি!’ ছাদ ফুঁড়ে লাফিয়ে ওঠার জোগাড় হলো জ্যোতির। ‘কই দেখি চিঠিটা!’

মাথা দোলাল উপম। ‘হবে না।’

‘কি?’

‘আমাকে অপমান করে অনেক বড় অপরাধ করেছিস,’ গম্ভীর গলায় বলল হরর ক্লাব সদস্য। ‘আগে সেজন্যে মারফ চাইতে হবে তোকে। তারপর মেহমানদারী। তারপর জরিমানা হিসেবে আরেকবার মেহমানদারী। তারপর—’

হেসে ফেলল জ্যোতি। ‘আচ্ছা আচ্ছা! সব হবে, আগে ভেতরে আয়।’

‘হবে মানে? কখন হবে, কি হবে?’

‘তুই বললে এখনই হবে। এখানে দাঁড়িয়েই।’

সন্দেহে চোখ কুঁচকে উঠল উপমের। ‘এখানে দাঁড়িয়ে কি মেহমানদারী করবি তুই?’

জ্যোতি চিন্তার ভান করল। ‘বেশি কিছু কি করে করি বল?’

জানিসই তো মা বাসায় নেই,’ বলতে বলতে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর, যেন সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তুড়ি বাজাল। ‘পেয়ে গেছি!’

‘কি?’

‘এই ধর দুটো গাঁড়া, তারপর একটা চাঁটি। আর—হ্যাঁ, সবশেষে পাছায় কষে দুটো লাথি। কেমন হয়?’

‘ব্যস ব্যস, অতকিছু দরকার নেই,’ হেসে উঠল উপম। ‘বেশি খেলে রাতে ভাত খেতে পারব না।’

হাসতে হাসতে ভেতরে এসে বসল দুই বন্ধু। ‘এই নে,’ পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিল উপম। ‘পড়ে দেখ।’

ব্যস্ত হয়ে পড়তে শুরু করেছিল জ্যোতি, এমন সময় আবার কলিংবেল বেজে উঠল। ‘আবার কে?’ বিরক্ত গলায় বলল ও।

‘তুই পড়তে থাক, আমি দেখছি,’ উঠে গেল উপম। একটু পর রাজাকে নিয়ে ফিরে এল। ‘নে, হয়ে গেল দল গঠন। রাজা হাজির।’

গাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল রাজার। পালা করে দুই বন্ধুকে দেখল ও, জ্যোতির হাতের চিঠিটা দেখল। ‘দল গঠন মানে? কিসের দল? রাজনীতিতে নামছিস নাকি?’

হেসে উঠল জ্যোতি। হাতের চিঠিটা দোলাল। ‘অভিযাত্রী দল।’

‘মানে?’

‘মানে সেন্ট মার্টিন যাচ্ছি আমরা,’ উপম বলল। ‘তুইও যাচ্ছিস।’

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

‘অ্যা?’ হাঁ হয়ে গেল রাজা ।

মাথা দোলাল উপম । ‘অবশ্য তুই যদি যেতে না চাস, তাহলে—’

‘চাই না মানে?’ চেষ্টা করে উঠল রাজা । গলায় গাম আটকে যেতে খকখক করে কেশে উঠল । ‘যাহ্! গেল ভেতরে ঢুকে । কেবল মুখে দিয়েছিলাম ।’ উপমের দিকে ঘুরল ও । ‘যাব না মানে? ঘরে বসে থেকে শেকড় গজিয়ে গেছে আমার । ব্যাপার কি, খুলে বল্ দেখি! মানে প্যাচটা খুলে ফেল্ দেখি ।’ হাসল ও ।

‘আমি বলছি,’ বলল উপম । ‘আমার চাচা চট্টগ্রাম ভার্শিটির মেরিন বায়োলজিস্ট ডিপার্টমেন্টের হেড । নিজের ভাসমান ল্যাব নিয়ে গত তিন সপ্তা ধরে সেন্ট মার্টিনে গবেষণা করছেন উনি ।’

‘কি নিয়ে?’ রাজা প্রশ্ন করল ।

‘সামুদ্রিক মাছ আর উদ্ভিদ । বছরের ছয় মাসই সাগরে থাকেন চাচা । গত বছর বলেছিলেন, এবার যখন সাগরে গবেষণা করতে যাবেন, তখন আমাকে ডাকবেন ।’ শাগ করল উপম । ‘ব্যস, ডাক এসেছে । সাথে দুই-একজন বন্ধু নিয়ে যেতে বলেছেন । দারুণ জমবে তাহলে ।’

বাবল গামের খোঁজে পকেটে হাত ভরে দিল রাজা । ‘ওফ্, বাঁচলাম! ঘরে বসে দিন আর কাটছিল না ।’ টুপ্ করে একটা গাম মুখে পুরল ও । ‘আল্লাহ তোর চাচাকে বাঁচিয়ে রাখুন হাজার বছর । বছরে অন্তত একবার যেন তাঁর সাথে সাগরে বেড়াতে যেতে পারি ।’

‘কবে যাচ্ছি আমরা?’ জ্যোতি প্রশ্ন করল ।

‘কালই,’ চওড়া হাসি দিল উপম। ‘শুভ কাজে দেরি করতে
নেই।’

কিন্তু উপম যদি জানত ওখানে কি ভয়ানক দুঃস্বপ্ন ওত পেতে
আছে ওদের জন্যে, তাহলে কথাটা বলত না ও।

দুই

বঙ্গোপসাগরের দুশো ফুট গভীরে রয়েছে এখন জ্যোতি। ওর
কবজিতে বাঁধা খুদে ডেপথ গজ তাই বলছে।

প্রাণ বাঁচানোর সংগ্রামে ব্যস্ত। সাদা রঙের দৈত্যাকার এক চ্যাপ্টা
খুনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করছে। ওটা একটা মাছ।
নাম স্টিং রে। স্থানীয় ভাষায় কি যেন বলে একে, কিন্তু অনেক চেষ্টা
করেছে জ্যোতি, কোনমতেই উচ্চারণ করতে পারে না। ভারি
খটমটে একটা নাম।

বাধ্য হয়ে ওটাকে তাই ‘চ্যাপ্টা’ বলে ডাকে জ্যোতি। শক্তিশালী
শিরদাঁড়া দিয়ে শিকার করে ওটা। এরমধ্যে দশজন জেলের মৃত্যু
হয়েছে চ্যাপ্টার আক্রমণে। মানুষ এর ভয়ে আজকাল পানিতে নামা
বন্ধই করে দিয়েছে।

আজ ওটারই খপ্পরে পড়েছে জ্যোতি। আরও গভীরে কোথাও আছে ওটা, খুনী 'চ্যাপ্টা'। আক্রমণের সুযোগ খুঁজছে।

জ্যোতিও তৈরি। ওর হাতে বিষাক্ত হারপুন-গান রয়েছে। বন্দুকের মত টিগার আছে ওটার, টিপলেই চকচকে ধাতুর তৈরি খুদে বর্ষা ছুটে যায় শিকারের দিকে। বিষাক্ত বর্ষা, লাগলে আর রক্ষা নেই।

কালো রাবারের ডুবুরির পোশাক পরে আছে জ্যোতি, চোখে কাঁচের মাস্ক। পিঠে অক্সিজেন সিলিন্ডার, ওখান থেকে বেরিয়ে আসা পাইপের মাথায় লাগানো মাউথপীস কামড়ে ধরে আছে। সাঁতারের গতি বাড়াতে পায়ে পরেছে ফ্লিপার। জুতোর মতই দেখতে, তবে বেশ বড়।

কি যেন একটা নড়ল না? ভাবল জ্যোতি। দৃষ্টিসীমার বাইরে? হারপুন-গান তুলে আক্রমণ ঠেকাতে তৈরি হলো ও।

হঠাৎ করে সামনের সব ধোঁয়াটে হয়ে উঠল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না ও। ব্যাপার কি? মাস্ক ঘোলা হয়ে গেল কেন? দম আটকে আসছে!

জোরে শ্বাস নেবার চেষ্টা করল ও। হলো না।

আঁতকে উঠল জ্যোতি। সর্বনাশ! অক্সিজেন ট্যাঙ্কে কোন সমস্যা হলো নাকি? কেউ পাইপ কেটে দিয়ে গেছে?

নষ্ট করার মত সময় নেই। পানির দু'শো ফুট তলায় আছে জ্যোতি, অথচ দর্ম নেয়ার উপায় নেই। অতএব দ্রুত ওপরে উঠে যেতে হবে—উপায় নেই।

ফ্লিপার দিয়ে পানিতে জোরে বাড়ি মারল ও। মরিয়া হয়ে উঠে

যেতে শুরু করল। বাতাসের অভাবে হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরিত হতে বসেছে।

শক্তি কমে আসছে। ঝাপসা দেখছে জ্যোতি।

পারবে ও পৌছতে? নাকি এখানেই মৃত্যু লেখা ছিল, গভীর সাগরে? চ্যাপ্টার খাবারে পরিণত হবে?

আতঙ্কে হাত-পা অসাড় হয়ে এল জ্যোতির। ঝাপসা কাঁচের ওপাশে হন্যে হয়ে উপম আর রাজাকে খুঁজল। রাঙাবালির দুর্ধর্ষ অভিযানের পর সাঁতার শিখে নিয়েছে ওরা। এখন ওরা পাকা সাঁতারু।

কোথায় গেল ওরা? এই চরম বিপদের সময়—

ওপরে তাকাতেই ওদের দেখতে পেল জ্যোতি। মাথা পানির ওপরে।

বাঁচাও! দুই বন্ধুকে উদ্দেশ্য করে চৈতাল জ্যোতি। বাঁচাও! কিন্তু একরাশ বুদ্ধ বেরোল কেবল মুখ দিয়ে। আওয়াজ বেরোল না। পাগলের মত হাত নাড়তে লাগল ও উপায় না দেখে।

ভাগ্য ভাল, দেখতে পেয়েছে রাজা। উপমকে নিয়ে দ্রুত কিছুটা নেমে এসে ওকে ধরল, টেনে তুলল পানির ওপর।

‘কি রে!’ বিস্মিত হয়ে রাজা বলল। ‘কি হয়েছে?’

‘পানির ভূত দেখেছিস নাকি?’ উপম বলল।

দম ফিরে পাবার জন্যে কিছুক্ষণ হাঁসফাঁস করল জ্যোতি। কোনমতে বলল, ‘কেউ—কেউ আমার অক্সিজেন পাইপ—কেটে দিয়েছে!’

পরক্ষণে জ্যোতির চোখের সামনে সব আঁধার হয়ে গেল।

তিন

ঘাড় ধরে আবার ওকে পানির নিচে পাঠিয়ে দিল রাজা। ঝাঁকি মেরে উঠে এল ও। দেখল ওরা হাসছে।

‘না ঘুমিয়েই নাক ডাকাচ্ছিস নাকি, হাঁদারাম!’ উপম বলল।

সুস্থির হয়ে মাথা ঝাঁকাল জ্যোতি। মৃত্যুভয় কেটে গেছে। হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল।

‘অ্যাই, কি করছ তোমরা?’ ওপর থেকে ডেকে উঠলেন উপমের চাচা ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম। নিজের ভাসমান গবেষণাগারের রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চট্টগ্রাম ভার্শিটির মেরিন বায়োলজির হেড তিনি। উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলের সাগরের নিচের জগৎ নিয়ে গবেষণায় বছরের অর্ধেক কাটে তাঁর।

নিজের এঞ্জিনচালিত বড় এক বোট আছে। ওটাই তাঁর গবেষণাগার। একজন সহকারী আছে। সময় সুযোগ পেলেই বেরিয়ে পড়েন, এক-দুই সপ্তাহ, কখনও বা মাসও কাটিয়ে আসেন সাগরে। এবারও একই কাজে ব্যস্ত নেয়ামুল ইসলাম—সেন্ট মার্টিন দ্বীপে।

ওদিকে ঢাকায় ভাস্তে উপম বেকার। গরমের ছুটিতে বসে বসে ভেরেভা ভাজছে। তাই চিঠি লিখে দুই-একজন বন্ধু নিয়ে এখানে বেড়িয়ে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

গতকাল দুই বন্ধু নিয়ে এখানে পৌঁছেছে উপম। ঢাকায় ওরা কি এক হরর ক্লাব খুলেছে, তার সদস্য সবাই।

ডক্টর ইসলাম ছোটখাট মানুষ, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। মাথায় মস্ত টাক। গবেষণায় লেগে থাকতে থাকতে বিয়ে করার সময় পাননি, এতই ব্যস্ত মানুষ। আপনভোলা। অনেক দুর্লভ উদ্ভিদ আর মাছ আবিষ্কার করেছেন, তাঁর আগে সেন্সরের কথা কেউ শোনেনি পর্যন্ত।

তাঁর ভাসমান গবেষণাগারের নাম ‘সীগাল’। নিচতলার বেশির ভাগই ব্যবহার হয় গবেষণার কাজে। অ্যাকুইরিয়ামের মত বড় বড় কাঁচের জার আছে। নতুন প্রজাতির অচেনা মাছ ধরে ওর মধ্যে রেখে গবেষণা করেন তিনি, প্রয়োজনে ওগুলোর চিকিৎসাও।

বোটের ওপরের প্রায় পুরোটা খোলা, হুইল হাউস বা ককপিট ছাড়া। ছোট এক কেবিন ওটা। ওর মধ্যে বসে কখনও নিজে, কখনও তাঁর সহকারী চালায় বোট।

‘খবরদার, দূরে যেয়ো না যেন কেউ,’ আবার বললেন বিজ্ঞানী। ‘বিশেষ করে হরর ক্লাবের চীফ, কি যেন নাম তোমার? ও হ্যাঁ, জ্যোতি।’ তর্জনী তুললেন তিনি শাসনের ভঙ্গিতে। ‘বুঝেছ তুমি, জ্যোতি?’ ও যে দুঃসাহসী, এর মধ্যেই বুঝে ফেলেছেন তিনি। তাই সতর্ক।

একান্ত বাধ্যগতের মত মাথা দোলাল ও। ‘জি, চাচা!’

‘ওড!’ বিজ্ঞানী মাথা ঝাঁকালেন। ‘যদি কথা না শোনো, তাহলে হাড়ে হাড়ে টের পাবে হরর কাকে বলে। শুনেছি এদিকে নাকি হাঙর দেখা গেছে দু’তিনদিন আগে।’

‘হাঙর!’ আঁতকে উঠল রাজা। ‘বলেন কি!’ হাঁ করা মুখের ফাঁক গলে ওর প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী বাবল গাম পানিতে পড়ে গেল। তলিয়ে গেল দেখতে দেখতে। বড় দুই বাস্ত্র গাম নিয়ে এসেছে ও ঢাকা থেকে, মুখে একটা না একটা সব সময়ই থাকে। সারাক্ষণ গরুর মত জাবর কাটে।

‘ঠিকই বলছি। বোটের কাছে থাকবে তোমরা। এখানে যত খুশি সাঁতার কাটো, ডুব দাও, কিন্তু দূরে যেয়ো না। আর ওই কোরাল রীফের কাছেও যাবে না কেউ।’

ওদের মাত্র কয়েকশো গজ দূরে আছে রীফটা। বিজ্ঞানী নেয়ামুল ইসলামের মতে গলদা চিংড়ি আর শামুকের খোসা বহু বছর ধরে জমে জমে ওটার সৃষ্টি হয়েছে। ভীষণ রকম বিষাক্ত। লাল রঙের বেশ লম্বা রীফ ওটা। বাংলায় শৈলশ্রেণী বলে।

সুবোধ ছেলের মত ওরা তিনজনই মাথা দোলাল। উপম বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রাজার বাঁদরামির জন্যে পারল না। ওর পিঠে জোরে এক চিমটি কাটল সে, রাবার স্যুটের ওপর দিয়েও বেশ জোরেই লাগল।

‘দাঁড়া!’ রাগে দাঁত কিড়মিড় করল উপম। ‘তোমার ইয়ার্কি বের করছি!’ চাপা গলায় হুমকি দিল।

‘কচু করবি তুই!’

‘আর হ্যাঁ,’ বললেন ডক্টর ইসলাম, ‘পানির ওপর হাঙরের ডানা

দেখলে কি করতে বলেছি মনে আছে তোমাদের?’

‘হ্যাঁ, চাচা,’ জ্যোতি বলল। ‘যতদূর সম্ভব নড়াচড়া কম করতে হবে তখন। বেশি হটোপুটি হলে হাঙর এগিয়ে আসতে পারে।’

খুশি হলেন চাচা। ‘হ্যাঁ, এই তো বেশ মনে আছে। যদি এই জিনিস চোখে পড়ে, ধীরেসুস্থে সাঁতরে বোটে চলে আসবে।’

‘আচ্ছা।’

আরেকবার ওদের সতর্ক করে চলে গেলেন বিজ্ঞানী।

উত্তেজনা অনুভব করল জ্যোতি। হাঙর? জীবন্ত? ওহ, একটা যদি আসত এদিকে! সত্যিকারের হাঙর দেখার শখ ওর বহুদিনের।

এদিক-ওদিক নজর বোলাল ও। ইস্, এখনই যদি একটা হাঙর দেখা যেত! যদি এমন হত এ-দিকেই তেড়ে আসছে ওটা, সোজা ওদের দিকে, কি যে দারুণ এক ব্যাপার হত!

আসল কথা উত্তেজনাকর একটা কিছু ঘটুক, জ্যোতি তাই চাইছে। একঘেয়েমী কাটবে তাহলে।

মূল দ্বীপ থেকে একটু দূরে আরেক খুদে দ্বীপে নোঙর ফেলে আছে ডক্টর ইসলামের গবেষণাগার। চারদিক থেকে কোরাল রীফে ঘেরা দ্বীপ এটা। দ্বীপ আর রীফের মাঝে চমৎকার শান্ত লেগুন।

রীফের দিকে তাকাল জ্যোতি। বিজ্ঞানী যাই-ই বলুন, যত হুঁশিয়ারই দিন না কেন, ওখানে জ্যোতি যাবেই।

ওদিকে রাজা উপমের অবস্থা ভিন্ন। ওরা উল্টে ভয় পেয়েছে। হাঙরের কথা শুনে। অবশ্য কেউ প্রকাশ করতে চাইছে না। চেপে রেখেছে।

‘জ্যোতি!’ ডেকে উঠল উপম। বোটের সামনের দিকের পানি

ইঙ্গিত করল। 'ওই দেখ, কত মাছ। চল, ওদিকে যাই।'

ঘুরে তাকাল ও। পানিতে ছোট ছোট বুদ্ধ উঠছে প্রচুর। মাউথপীস মুখে ভরে ডুব দিল ও। উপমকে অনুসরণ করে সেদিকে এগোল। রাজা অনুসরণ করছে জ্যোতিকে।

কিছুক্ষণের মধ্যে হাজার হাজার খুদে মাছের এক ঝাঁকের মধ্যে নিজেদের দেখতে পেল ওরা। ওদের চারদিকে পাক খাচ্ছে ওগুলো। টিউবলাইটের মত নীলচে দ্যুতি বের হচ্ছে ওগুলোর গা থেকে।

ওদের ছেড়ে অন্যদিকে এগোতে শুরু করল ঝাঁক। জ্যোতি চলল পেছন পেছন। চারদিকে পিচ্চি পিচ্চি মাছ, দারুণ এক দৃশ্য। ওদের সাথে ঘুরতে মজাই লাগছে।

হঠাৎ করে তীরের মত চারদিকে ছুটল মাছগুলো, অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে। জ্যোতির চোখ কুঁচকে উঠল, কি ব্যাপার! কিছু দেখে ভয় পেয়েছে ওরা?

চারদিকে তাকাল প্রধান। মাথার ওপর মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ। একটা লাল কিছু চোখে পড়ল জ্যোতির।

সেদিকে এগোল। চোখ কুঁচকে তাকাল। ওটা লাল কোরাল রীফ। বোকা হয়ে গেল জ্যোতি। সে কি! এতদূর চলে এসেছে ও?

ঘুরল, ফিরে যেতে হবে বোটের কাছে। যদিও মন চাইছে না। আরেকটু থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। এসেই যখন পড়েছে, কি আর হবে দু'চার মিনিট থাকলে?

লাল বালুর তৈরি দুর্গের মত দেখাচ্ছে রীফটাকে। অনেক ছোট ছোট গর্ত আর বড় ফোকর আছে। ছোট-বড় মাছ সাঁ করে ঢুকে যাচ্ছে ওর মধ্যে, আবার বেরিয়ে আসছে। উজ্জ্বল রঙের মাছ

ওগুলো, চক্চকে গা।

একটা বড় ফোকরে ঢুকলে কেমন হয়? ভাবল জ্যোতি।
কতখানি বিপজ্জনক ওগুলো?

ইঠাৎ কিছু একটার সাথে ঘষা খেল ওর পা। কেমন একটা
শিহরণ বয়ে গেল। ঘুরে তাকাল জ্যোতি।

মাছ নাকি?

চারদিকে তাকাল, কিন্তু দেখা গেল না কিছু। আবার শিহরণ
অনুভব করল জ্যোতি। পরক্ষণে ওর পা আঁকড়ে ধরল কি যেন।

ব্যস্ত হয়ে সেদিকে তাকাল ও, কিন্তু এবারও কিছু চোখে পড়ল
না।

বুকের মধ্যে ধড়ফড় করে উঠল। জিনিসটা বিপজ্জনক কিছু
মনে হয় না, তবু যদি দেখা যেত!

ঘুরে বোটের দিকে রওনা হলো জ্যোতি, ফ্লিপার দিয়ে জোরে
বাড়ি মারল পানিতে। কিন্তু এগোতে পারল না।

ওর ডান পা আঁকড়ে ধরেছে কিছু একটা। টেনে ধরে রেখেছে।

ভয়ে জমে গেল জ্যোতি কয়েক মুহূর্তের জন্যে, পরক্ষণে
পাগলের মত পা ছুঁড়ল গায়ের জোরে। কাজ হলো না। পা ছাড়াতে
পারল না ও।

লাফঝাঁপের ফলে পানিতে জোর আলোড়ন উঠেছে, কাঁচের
মাস্কের ওপাশে সব অস্পষ্ট দেখাচ্ছে।

অনেক অনেক পানির ওপরে মুখ তুলে দুর্বল গলায় চৈচিয়ে
উঠল জ্যোতি, 'বাঁচাও!'

কোন লাভ হলো না।

ভয়ানক দুঃস্থ

পা ধরে থাকা ওটা যা-ই হোক, জ্যোতিকে টেনে নামাতে
চাইছে। ডুবে যাচ্ছে ও।

তলিয়ে যেতে শুরু করল।

চার

‘বাঁচাও!’ প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল জ্যোতি। ‘উপম! রাজা!!
বাঁ—’

চিৎকার শেষ করার সুযোগ পেল না, তলিয়ে গেল টান খেয়ে।
ডান গোড়ালিতে সরু ফিতের মত কি যেন একটা জড়িয়ে আছে,
টের পাচ্ছে ও।

অনেক কষ্টে ঘুরে তাকাল জ্যোতি। এবং দেখতে পেল
ওটাকে। বিশাল গাঢ় সবুজ রঙের এক সাগর দানব!

অষ্টোপাস!

প্রচণ্ড ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দশা হলো হরর ক্লাব
প্রধানের। আলোড়িত পানির ভেতর দিয়ে বড়, ড্যাবডেবে এক
চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে দানবটা—বাদামী চোখ। জুল্জুল
করছে চাউনি। গাঢ় নীল রঙের প্রকাণ্ড এক বেলুনের মত দেখাচ্ছে

ভয়ঙ্কর, কুৎসিত প্রাণীটাকে। মুখ খোলা ওটার, ভেতরের দুই সারি
উঁচুনিচু ধারাল দাঁত দেখা যাচ্ছে।

বিশাল এক দানব! কম করেও বারোটা গুঁড়। চাবুকের মত সরু
প্রান্ত গুঁড়গুলোর। তার একটা ওর গোড়ালি পৈঁচিয়ে ধরে রেখেছে,
আরও একটা এগিয়ে আসছে।

আঁতকে উঠল জ্যোতি দ্বিতীয় গুঁড় দেখে।

দু'হাত আর মুক্ত পা দিয়ে পানিতে জোরে জোরে আঘাত
করতে লাগল নিজেকে ছাড়াবার জন্যে। উঠে যেতে চাইল।

কিন্তু ছাড়ল না ওটা। সামান্য ঢিল দিয়েই ফের টানতে লাগল
নিচের দিকে। এইভাবে মৃত্যু লেখা ছিল ভাগ্যে, বিশ্বাস করতে
পারছে না জ্যোতি। সমস্ত স্মৃতি ফাস্ট মোশন ছায়াছবির মত ভেসে
উঠল চোখের সামনে। এই তো সেদিনের কথা, প্রথম যেদিন স্কুলে
যায় ও, স্কুল বাসে ওঠার সময় বাবা-মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হাত
নেড়ে বিদায় জানানেন। তারপর—এই তো, মাত্র দু'দিন আগে
সেন্ট মার্টিন রওনা হবার সময় বারবার করে সাবধান থাকার জন্যে
বলে দিয়েছিলেন।

এই জনমে কি ওঁদের সাথে দেখা হবে আর?

ওহ, কি ভয়ঙ্কর মৃত্যু!

চোখের সামনে সবকিছু লালচে হয়ে আসছে। ভীষণ দুর্বল
লাগছে।

হঠাৎ ওপর থেকে টান খেয়ে হুঁশ হলো জ্যোতির। কেউ টানছে
ওকে ওপরদিকে। অক্টোপাসের টানের থেকে জোরাল টান।

ভুশ্ করে ওপরে উঠে এল জ্যোতি। কাশল খকখক করে।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

পানিতে ভরে গেছে চোখ। কিছু দেখতে পাচ্ছে না।

একটু পর দেখল। উপমের চাচা উদ্বিগ্ন চোখে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে। বাহু ধরে ঝাঁকচ্ছেন।

‘জ্যোতি! তুমি ঠিক আছ?’

কোনমতে মাথা দোলাল ও। ডান পা ছুঁড়ল। নেই বাঁধনটা, ছেড়ে দিয়েছে ওকে সাগর দানব।

‘তোমার চিংকার শুনে ছুটে এসেছি আমি,’ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন বিজ্ঞানী। ‘কি হয়েছে? তুমি এখানে কেন? এদিকে আসতে না নিষেধ করেছি আমি?’

কথার ফাঁকে দু’হাতে ওকে লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে দিলেন তিনি। ওটা ভাসিয়ে রাখল জ্যোতিকে। হুড়োহুড়িতে ফ্লিপার দুটো খসে পড়ে গেছে ওর।

ওরা বোটের দিকে এগোতে দ্রুত পানি কেটে এগিয়ে এল উপম আর রাজা। ‘কি রে, কি হয়েছে?’ রাজা বলল।

উপম মাথা ঝাঁকিয়ে চোখের ওপর থেকে পানি সরাল। ‘ষাঁড়ের মত টেঁচাচ্ছিল কেন রে?’

‘ওটা—ওটা আমার পা টেনে ধরেছিল,’ কোনমতে জ্যোতি বলল। ‘আমাকে নিচে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল।’

‘কি সেটা?’ চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করলেন ডক্টর ইসলাম। ‘আমি তো কিছু দেখতে পেলাম না।’

‘একটা সাগর দানব! অনেক বড়। একটা গুঁড় দিয়ে আমার পা টেনে ধরেছিল ওটা। টেনে—’

‘অক্টোপাস!’ হতভম্ব চেহারা হলো তাঁর। ‘কি বলছ?’

‘হ্যা, অষ্টোপাস,’ মাথা দোলাল জ্যোতি ।

ডানে-বাঁয়ে মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী । চাউনিতে অবিশ্বাস ।
‘হতে পারে না । ভুল দেখেছ তুমি । এদিকে প্রচুর উদ্ভিদ আছে,
হয়তো তার কৌনটার সাথে পৈঁচিয়ে গিয়েছিল তোমার পা ।’

‘কিন্তু আমি যে নিজ চোখে দেখলাম ওটাকে! অনেকগুলো
গুঁড় । বড় বড়, ধারাল দাঁত, আর—’

‘তুই নিশ্চয় ভুল দেখেছিস,’ উপম মন্তব্য করল । ‘তেমন কিছু
থাকলে অবশ্যই চাচার চোখে পড়ত । অথবা ঘটনা প্যাচ
খাওয়াচ্ছিস ।’

রাজা মাথা দোলাল । ‘তাই হবে ।’

মেরিন বায়োলজিস্ট হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলালেন । গম্ভীর
গলায় বললেন, ‘আমি বিশেষ করে তোমাকে বারবার বলেছি
বোটের কাছাকাছি থাকবে । দূরে যাবে না । খুব খারাপ কাজ
করেছ । উচিত হয়নি । খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তুমি আমাকে,
জ্যোতি ।’

চুপ করে থাকল ও । অপরাধী চেহারা ।

ডুব দিয়ে এক মুঠো সবুজ লতাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে এলেন
বিজ্ঞানী । জ্যোতির দেখা ‘অষ্টোপাসের’ গুঁড়ের মতই লাগছে
ওগুলোকে । ‘এই দেখো, এগুলোয় পা আটকে গিয়েছিল তোমার ।
অষ্টোপাস-ফষ্টোপাস নয় ।’

‘কিন্তু—’

‘আম্হা, ঠিক আছে,’ ওকে থামিয়ে দিলেন তিনি । লতাগুলো
ফেলে দিলেন । ‘আগে বোটে চলো । ওখানে গিয়ে কথা বলব এ-
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

নিয়ে।’

সাঁতার শুরু করলেন চাচা। ‘এসো তোমরা আমার সাথে। সাবধান, নজর রেখো, কোরাল রীফের ছোঁয়া লাগে না যেন গায়ে।’

আগে আগে সাঁতরে চললেন বিজ্ঞানী। উপম আর রাজা অনুসরণ করছে। জ্যোতি ভেসে থাকা সবুজ লতাগুলোর দিকে কিছুক্ষণ বোকায় মত তাকিয়ে থাকল, তারপর ধীর বেগে এগোল।

রাগে ফুঁসছে ভেতরে ভেতরে। কেন ওর কথা বিশ্বাস করছে না কেউ?

জ্যোতি নিজের চোখে দেখেছে জিনিসটাকে। কোনমতেই সামুদ্রিক উদ্ভিদ হতে পারে না ওটা। কোনমতেই না। তাহাড়া জ্যোতি এত বেকুব নয় যে যা সত্যি নয়, তাই দেখে বিশ্বাস করে বসে থাকবে।

ও যে ভুল দেখেনি, তা প্রমাণ করে দেখাতে হবে সবাইকে, প্রতিজ্ঞা করল জ্যোতি। ওটাকে আবার খুঁজে বের করবে ও, ডেকে দেখাবে সবাইকে।

আজ নয় কাল। অথবা পরশু, অথবা তারপর দিন। অথবা—।

যেদিনই হোক, মোট কথা প্রমাণ করতেই হবে যে ওর নয়, ভুল হয়েছে বিজ্ঞানীর। ভুল হয়েছে উপম-রাজার।

গতি বাড়িয়ে দিল ও। পানির জোর ছাড়া ছাড়া আওয়াজে সাঁতার খামিয়ে ঘুরে তাকাল ওরা দু’জন। জ্যোতিকে দেখল চোখ কুঁচকে। ‘কি রে, রেস দিবি নাকি?’

বঁাকা হাসি ফুটল প্রধানের মুখে। আগে একবার রাঙাবালি বেড়াতে গিয়ে সাঁতার জানে না বলে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হয়েছিল

ওদের। তাই ঢাকায় ফিরেই সাঁতার শিখে নিয়েছে দলের সবাই। জ্যোতি আগে থেকেই জানত, তবু নতুন করে আবার প্র্যাকটিস করেছে। সাঁতারে রীতিমত ওস্তাদ এখন ও। উপম আর রাজা কি রেস লড়বে ওর সাথে?

‘কোন পর্যন্ত?’ প্রশ্ন করল ও।

‘বোট পর্যন্ত,’ রাজা বলল।

‘ঠিক আছে। তবে আমার পায়ে ফ্লিপার নেই, কাজেই তোদেরও খুলে ফেলতে হবে ওগুলো। খালি পায়ে সাঁতরাতে হবে।’

‘না, তা হবে না,’ বলেই ঘুরে প্রাণপণে ছুটতে লাগল উপম। ওর দেখাদেখি রাজাও। ‘পারলে আয়,’ বলল উপম হাসতে হাসতে। ‘দেখি কত ওস্তাদ তুই।’

ঠিক আছে, জ্যোতি ভাবল। দেখাচ্ছি। কোনাকুনি সাঁতারে এগোল ও। সামনে ছোট একটা কোরাল রীফ। ওটার ওপর দিয়ে যাবে ও। কিন্তু রাজা, উপমের সে সাহস নেই। ওরা রীফ ঘুরেই যাবে। এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে।

ওদিকে বোটের পাটাতনে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর নজর রাখছিলেন উপমের চাচা, জ্যোতির মতলব বুঝতে পেরে আঁতকে উঠলেন। ‘জ্যোতি!’ চৈঁচিয়ে উঠলেন তিনি। ‘ওদিকে যেয়ো না! রীফের দিকে যেয়ো না! ফিরে এসো!’

না শোনার ভান করল কিশোর। উপম আর রাজাকে হারানো ছাড়া আর কোন চিন্তাই নেই ওর এই মুহূর্তে। যে করে হোক, ওদের পেছনে ফেলতেই হবে।

খুব দ্রুত রীফের ওপর পৌছে গেল জ্যোতি । ঘাড় ঘুরিয়ে ওরা
কোথায় আছে দেখতে চেষ্টা করল । মুহূর্তের জন্যে অমনোযোগী
হয়ে পড়েছিল ও, বেখেয়ালে পা লেগে গেল লাল কোরাল রীফের
কর্কশ গায়ে ।

পর মুহূর্তে ভয়ে, বিস্ময়ে আর যন্ত্রণায় চোঁচিয়ে উঠল জ্যোতি ।

পাঁচ

এমন ভীষণভাবে জ্বলছে পা, জ্যোতির মনে হলো আগুন ধরে গেছে
বুঝি । অসহ্য এক দপ্‌দপে ব্যথা পা বেয়ে ওপর দিকে উঠে আসছে ।

আবার চোঁচিয়ে উঠল ও । তলিয়ে গেল, হাবুডুবু খেতে লাগল ।

ওদিকে থমকে গেছে উপম ও রাজা । সাঁতার খামিয়ে পেঁছনে
এক পলক তাকিয়েই চিৎকার করে চাচাকে ডাকতে লাগল উপম ।

জ্যোতির পা জ্বলছে ভীষণ । ঠাণ্ডা পানিও কোন কাজে আসছে
না ।

বোট থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম, খুব দ্রুত
পৌছে গেলেন ওর কাছে । ‘কি হয়েছে, জ্যোতি?’ গলা শুনে তাঁকে
বিরক্ত মনে হলো ।

‘আমার পা!’ ফুঁপিয়ে উঠল জ্যোতি। ‘বোধহয় রীফে ঘষা খেয়েছে, জ্বলছে খুব।’

স্বস্তি ফুটল বিজ্ঞানীর চেহারা। ‘ওহ! তাও ভাল।’ এক হাতে ওর কাঁধ চাপড়ে দিলেন তিনি। ‘ভয় পেয়ো না। একটু পরই ঠিক হয়ে যাবে সব।’

উপম আর রাজাও এসে পড়ল, ওর কোথায় লেগেছে জানতে চাইল। পাত্তা দিল না জ্যোতি। ওদের জন্যেই এই অবস্থা ওর।

‘যে কোরালে তোমার পা লেগেছে,’ বললেন ডক্টর ইসলাম, ‘ওটা লাল কোরাল। ওর আরেক নাম আগুন কোরাল।’

‘আগুন কোরাল!’ বিস্মিত হলো জ্যোতি।

‘হ্যাঁ। আগুন কোরাল। বিস্মাক্ত। যেখানেই ওর ছোঁয়া লাগুক, মনে হবে বুঝি আগুন ধরে গেছে।’

‘হ্যাঁ, আমি জানতাম,’ উপম বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল।

রাগ হলো খুব জ্যোতির। ইচ্ছে হলো কষে এক চড় মারে বাদরটার গালে। সমস্যা বাধিয়ে এখন উস্কানি দিচ্ছে।

‘তোমার ভাগ্য ভাল যে শুধু ছোঁয়া লেগেছে পায়ে,’ বললেন উপমের চাচা। ‘যদি কেটে যেত, ভেতরে বিষ ঢুকে রক্তে মিশে যেত। তাহলে অনেক বড় ঝামেলা হয়ে যেত। এই জন্যেই কোরাল রীফ থেকে সরে থাকতে বলেছি আমি বারবার।’

‘ওরে বাবা!’ রাজা বলে উঠল। ‘খুব জঘন্য জিনিস তো!’

‘হ্যাঁ,’ চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল বিজ্ঞানীর। ‘কোরালের বিষ মানুষকে পঙ্গু করেও দিতে পারে।’

‘বাপরে, কি সাঙ্ঘাতিক!’ উপম বলল।

‘কাজেই এরপর থেকে বড় কোরাল রীফ থেকে দূরে থাকবে তোমরা, সবাই। মনে থাকবে?’

‘কিন্তু সেই অক্টোপাসটা তো ওখানেই থাকে!’ প্রতিবাদের সুরে জ্যোতি বলল। ‘না যেতে পারলে ওটা আপনাদের দেখাব কি করে?’

মুখের মধ্যে পানি নিয়ে বিচ্ছিরি আওয়াজ করল উপম। ‘দূর, ভুল দেখেছিস তুই, বুঝলি? ওসব এই এলাকায় নেই, কি বলেন, চাচা?’

‘নেই, এমন কথা বলা যায় না। থাকতেও পারে। শোনো, তোমরা কেউ ভুলেও আর ওদিকে যাবে না, বুঝেছ? হয়তো ওখানে সাগর দানব নেই, অক্টোপাস নেই। তবে হাঙর থাকতে পারে, বিষাক্ত অনেক রকম মাছ থাকতে পারে, বৈদ্যুতিক ঈল থাকতে পারে, কাজেই—’

‘ইলেক্ট্রিক ঈল!’ বলল জ্যোতি। ‘সে কি জিনিস, চাচা?’

‘ঈল হচ্ছে বান মাছের ইংরেজি নাম। ডাবল ই এল। অবশ্য আমরা যে বান মাছ খাই, এগুলো তার চেয়ে অনেক বড়। গায়ে কারেন্ট আছে, শত্রুকে কারেন্টের শক দিয়ে কাবু করে ওরা।’

‘আশ্চর্য!’

হাসি ফুটল বিজ্ঞানীর মুখে। ‘আরও অনেক অনেক আশ্চর্য জিনিস, মানে জলচর প্রাণী আছে সাগরে। যার কোন লেখাজোখা নেই। তোমরা তো দূরের কথা, আমরা বিজ্ঞানীরাই আজও পর্যন্ত তার সব চিনে উঠতে পারিনি। পৃথিবীতে মাটি হচ্ছে একভাগ, আর পানি তিন ভাগ। কাজেই প্রাণী বলো বা জন্তু, সাগরেই বেশি।

তোমার পায়ের অবস্থা কি, জ্যোতি?’

‘এখন একটু ভাল।’

‘ঠিক আছে, বোটে চলো এবার। খাওয়ার সময় হয়েছে।’

সবাই মিলে সাঁতরে বোটের দিকে চলল ওরা। বিজ্ঞানী
রয়েছেন সবার আগে। হঠাৎ কি যেন একটা লাগল জ্যোতির পায়ের,
সুড়সুড়ি লেগে উঠল।

সামুদ্রিক লতাপাতা?

না।

তাহলে? নিশ্চয় দুই বাঁদরের একটা হবে।

এবার উরুতে সুড়সুড়ি লাগল।

কে রে? নাম ধরে উপম-রাজাকে ডাকতে যাচ্ছিল ও, কিন্তু
দেখা গেল ওরা দু’জনই সামনে রয়েছে। চাচার পাশাপাশি সাঁতরে
চলেছে।

তাহলে?

উপম নয়, রাজা নয়, তাহলে কে?

ডুব দিল জ্যোতি, নিচে তাকাল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত জোর
এক ঝাঁকি খেল ভয়ে।

কি ওটা?

কই, কিছুই তো নেই, তাহলে?

অদৃশ্য কিছু লেগেছে জ্যোতির পেছনে?

কি হতে পারে সেটা?

ছয়

বিজ্ঞানীর সহকারী মোকারম হোসেন সবাইকে বোটে উঠতে সাহায্য করল। হাত ধরে টেনে তুলল ওদের। অল্প বয়সী সে। বেশ লম্বা-চওড়া।

‘তোমাদের চিংকার শুনলাম যেন?’ বলল লোকটা। ‘কি হয়েছিল?’

ডক্টর ইসলাম উত্তর দিলেন ওদের হয়ে। ‘ও কিছু নয়, সব ঠিক আছে। জ্যোতি ভুল করে পা দিয়ে ফেলেছিল বড় কোরালে।’ মোকারম হোসেনের চোখ বড় বড় হয়ে উঠতে দেখে মাথা ঝাঁকালেন তিনি। ‘না, ভয়ের কিছু নেই। এখন ঠিক হয়ে গেছে।’

প্রশ্নবোধক চোখে জ্যোতিকে দেখল লোকটা কিছুক্ষণ। ‘বড় বাঁচা বেঁচে গেছ তুমি, খোকা,’ বলল সে। ‘প্রথমবার এখানে এসে আমিও পা দিয়ে ফেলেছিলাম আগুন কোরালে, বুঝলে? ওরে বাবা, সে কি জ্বালাপোড়া! চোখে রীতিমত সর্ষেফুল দেখেছি আমি কয়েক ঘণ্টা। তোমার কোন কষ্ট হচ্ছে না তো?’

মাথা দোলাল ও। জায়গাটা দেখাল তাকে। ‘না, কোন কষ্ট

হচ্ছে না। কিন্তু এর চেয়েও বড় কাণ্ড ঘটেছে ওখানে।’

‘সেটা কি?’ প্রশ্ন করল লোকটা।

‘একটা অষ্টোপাস আমাকে—’

‘আরে না!’ তাড়াতাড়ি বাধা দিল উপম। ‘ওসব নেই এখানে।’

‘আমি কিন্তু সত্যি দেখেছি,’ পাত্তা না দিয়ে মোকারম হোসেনকে বলে চলেছে জ্যোতি। ‘ওরা বিশ্বাস না করলে কি হবে, যা সত্যি, তাই বলছি আমি। ওই লেগুনে আছে ওটা। বিরাট। সবুজ আর—’

হাসল লোকটা। ‘দূর! কি যে বলো না!’

এক ঘুঘিতে ব্যাটার দাঁত খসিয়ে দিতে ইচ্ছে হলো জ্যোতির।
ব্যাটা বিজ্ঞানের ছাত্র তো কি হয়েছে? কতদূর শিখেছে?

বিজ্ঞানের ছাত্র না ঘোড়ার ডিম। দেখে তো ব্যাটাকে ফুটবল খেলোয়াড় মনে হয়।

‘তোমাদের খিদে লেগেছে নিশ্চয়?’ বলল সে। ‘চলো, খেতে যাই।’

‘কি রান্না হয়েছে আজ?’ রাজা প্রশ্ন করল।

‘মুরগি ভুনা, পাঙাস মাছের ঝোল আর চিতল মাছের কোণ্ডা।’

চোখ কপালে উঠল জ্যোতির। ‘অঁ্যা, বলেন কি? এতসব করল কে?’

‘আমি করেছি,’ বলল সহকারী। মুখের চেহারা এমন করল যেন মোঘল রাজা-বাদশার বাবুর্চিগিরি করে এসেছে।

অথচ জ্যোতি জানে কি জঘন্য রান্না মোকারম হোসেনের।
সকালে যা খেয়েছে, এখনও পাথরের মত ভার হয়ে পড়ে আছে
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

পেটের মধ্যে। হজম হবে কি না; হলে কত সালে হবে, আন্না মালুম।

ভেজা কাপড় ছেড়ে খেতে বসল ওরা। খিদে লেগেছে বেশ, তাই নিজের প্রিয় মুরগি দিয়েই শুরু করে দিল জ্যোতি। একটা রান নিয়ে ভয়ে ভয়ে কামড় দিল। নাহ, খারাপ লাগছে না তো! মনের আনন্দে চিবাতে শুরু করল ও, সকালের ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার ইচ্ছে।

কিন্তু হলো না। প্রথম খণ্ড কয়েকবার চিবাতে না চিবাতে কাজ হয়ে গেল জ্যোতির। কয়েক সেকেন্ড বিস্ফারিত চোখে মোকারম হোসেনকে দেখল ও, চোয়াল হাঁ হয়ে আছে। তারপর আচমকা চিৎকার করে উঠল।

‘উহু, আহ! ওরে বাবা, মরে গেলাম! ফায়ার কোরাল দিয়ে রান্না করেছেন আপনি। উফ্, মুখ জ্বলে গেল—’ থাবা দিয়ে পানির গ্লাস তুলে নিল ও, কাত করে পুরো পানি চালান করে দিল গালের মধ্যে।

হাঁ করে ওর অবস্থা দেখছিল উপম। রাজার সাথে চোখাচোখি হতে হাসল। বিড়বিড় করে বলল, ‘ঘটনা প্যাঁচ খেয়ে গেছে।’

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল মোকারম হোসেন। বুঝতে পেরে হাসল। ‘ও। ঝাল একটু বেশি পড়ে গেছে বোধহয়।’

‘একটু বেশি!’ বলল জ্যোতি কোনমতে সামলে নিয়ে। ‘একে আপনি একটু বেশি বলছেন?’

চোখ তুলে সহকারীকে দেখলেন নেয়ামুল ইসলাম। ‘ঝাল কম দেয়া উচিত ছিল তোমার। জ্যোতি, তুমি বরং পাঙাস মাছ দিয়ে খেয়ে নাও। মুরগি খাওয়ার দরকার নেই।’

তাই করল ও। তবে প্রিয় খাবার খেতে না পাওয়ার কষ্টে জমল না। ওরা গপাগপ্ মুরগি দিয়েই খেয়ে উঠল। ওর অবস্থা দেখে ডক্টর ইসলাম বললেন, 'চিন্তা কোরো না, জ্যোতি। রাতের রান্না আমি করব। আমি ওর চেয়ে অনেক ভাল রাঁধতে পারি।'

'জি,' সুবোধ ছেলের মত মাথা দোলাল ও।

খাওয়া শেষ হতে বিজ্ঞানী গিয়ে বসলেন নিজের খুদে ল্যাব অফিসে, ওদিকে জ্যোতি, উপম আর রাজা মোকারম হোসেনের সাথে চাচার গবেষণাগার দেখতে এল। বড় তিনটে কাঁচের অ্যাকুইরিয়াম আছে ওখানে।

ভেতরে আজব ধরনের কিছু মাছ ভাসছে। একটা আছে উজ্জ্বল হলুদ রঙের, দুটো সী-হর্স ও গভীর পানির ট্রাম্পেট। পরেরটা লম্বা, টিউবের মত দেখতে। লাল ও সাদা রঙের দেহ। ওদের খুদে খুদে খাবার ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্যাঙ্কে—ওগুলোও মাছ।

আরেকটায় আছে কিছু জুলজুলে অ্যাঞ্জেল ফিশ। কমলা-লাল আগুনের মত রঙ ওগুলোর। শেষেরটায় ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো ও হলুদ রঙের সাপের মত দেখতে কিছু একটা। মুখ ভর্তি দাঁত ওটার।

'এ মা!' শিউরে উঠল রাজা চেহারা বিকৃত করে। 'কি বিচ্ছিরি!'

'ওটা ব্ল্যাক রিবন ঈল,' মোকারম হোসেন বলল। 'কামড় দেয় ওটা, তবে বিশেষ ক্ষতি হয় না তাতে। ইলেকট্রিক ঈলের মত ভয়ঙ্কর নয়।'

মুখ এগিয়ে ওটাকে ভেঙচি কাটল রাজা। পান্ডা দিল না ঈল, লেজ ঘুরিয়ে চলে গেল অ্যাকুইরিয়ামের ওপাশে।

'পছন্দ করেনি তোকে,' খোঁচা লাগাল উপম। 'বদ চেহারা

ওদের সহ্য হয় না।’

‘ঠিক বলেছিস,’ রেগেমেগে জোরে কয়েকবার গাম চিবাঁল ও।
‘তোকে পছন্দ ওর। নূরানী চেহারা তো! যা, তুই ঢুকে পড়
ভেতরে।’

ওদের তর্কে মজা পেয়ে হেসে উঠল মোকারম হোসেন। ‘ওটার
নাম রাজা,’ বলল সে। ‘আমি রেখেছি।’

জ্যোতি তাকিয়ে থাকল বানমাছটার দিকে। কল্পনা করছে
সাগরে ওটার মুখোমুখি পড়লে কি অবস্থা হবে। দাঁতগুলো যেমন
বড়, তেমনি ভয়ঙ্কর দেখতে।

কাছের একটা ছোট টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল ও। তার
ওপরে একটা প্যানেল আছে, কয়েকটা সুইচ আর ঘড়ির মত
কাঁটাওয়ালা ডায়াল বসানো ওটায়।

‘এগুলো কি?’

ঘুরে তাকাল মোকারম হোসেন। ‘এটা হচ্ছে কন্ট্রোল প্যানেল।
এইসব কাঁচের পাত্রের আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে এটা। টুকটাক
আরও অনেক কাজ করে।’

‘এটা কিসের?’ কালো, বড় একটা ডায়াল দেখাল ও।
অন্যগুলোর মত আলো জ্বলছে না ওটায়। মনে হয় কাজ করে না,
নষ্ট।

‘ওটা অকেজো হয়ে গেছে। সাগরের পানির স্যাম্পল পরীক্ষা
করা হয় ওটা দিয়ে,’ নাক চুলকাল সে।

‘ঠিক করছেন না কেন?’

‘অনেক পয়সার দরকার। অত পয়সা নেই আমাদের।’

‘ভার্সিটি গবেষণার জন্যে টাকা দেয় না?’ এবার উপম প্রশ্ন করল।

‘দেয়,’ মাথা ঝাঁকাল সে। ‘তবে যা দেয়, তাতে কাজ হয় না। এবারের অভিযানের জন্যে যে টাকা দিয়েছিল, তা কবেই শেষ।’

‘কাজের সময় যদি সাগরে নষ্ট হয়ে যায় বোট, বা যদি অন্য কিছু ঘটে, তখন মেরামতের টাকা কোথায় পাবেন?’

‘তেমন কিছু এখনও ঘটেনি। যদি কখনও ঘটেই যায়, স্যার নিশ্চয় কিছু না কিছু ব্যবস্থা করবেনই।’

হাসল যুবক। ‘তবে তোমাদের ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। সে ধরনের কিছু কখনও ঘটেনি আমার জানামতে।’

আরেকটা ডায়ালে মন দিল জ্যোতি। এটা দেখতে একটু অদ্ভুত। ‘এটা কিসের ডায়াল?’

‘ওটা সোনার প্রোব।’

‘সেটা কি?’ চোখ কৌচকাল জ্যোতি। ‘কি কাজ এটার?’

মাথা ঝাঁকাল সহকারী। ‘রাখো, দেখছি। আগে এদের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।’ মাছগুলো দেখাল ইঙ্গিতে।

প্রথম ট্যাঙ্কের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। সুপ ছাকনির মত বড় এক ছাকনি দিয়ে ভেতর থেকে বেশ কিছু খুদে মাছ-পোকা ইত্যাদি তুলল। ‘এগুলো রাজাকে খাওয়ানো হবে। তোমরা কেউ করতে চাও কাজটা?’

‘ই মা গো!’ শিউরে উঠে এক পা পিছাল উপম।

‘জ্যোতি, তুমি?’

দ্রুত মাথা দোলাল প্রধান। পাক খেয়ে উঠল পেটের মধ্যে।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

বাইরে একটা এঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল এমন সময়। বোধহয় কোন ট্রলার। জ্যোতি ভাবছিল এখনই মিলিয়ে যাবে শব্দ, দূরে সরে যাবে ওটা। কিন্তু না, বরং এগিয়ে এল। এদিকেই আসছে।

উঁকি দিয়ে বাইরে তাকাল ও। তারপর বেরিয়ে এল ল্যাব থেকে। মোকারম হোসেনও। হ্যাঁ, ট্রলারই। ডক্টর নেয়ামুল ইসলামের ভাসমান গবেষণাগারের চেয়ে বেশ ছোট। কাৎ হয়ে টেডেয়ের মাথায় দুলতে দুলতে এদিকেই আসছে। এটার গায়ের সাথে ভিড়বে মনে হচ্ছে।

ট্রলারটার পাশে বড় এক সাইনবোর্ড, তাতে লেখা:

সোনার বাংলা সার্কাস

চট্টগ্রাম

এক মাঝবয়সী লোক আর এক মহিলাকে দেখা গেল ওটার সামনের পাটাতনে। লোকটার পরনে বেশ দামী সিল্কের পাজামা-পাজাবি। মহিলার পরনে সালোয়ার-কামিজ। ওগুলোও সিল্কের। খুব সম্ভব স্বামী-স্ত্রী হবে।

কাপড়, জুতো, হাতঘড়ি আর মহিলার গহনাগাটি দেখলে মনে হয় যথেষ্ট পয়সাওয়ালা। লোকটার হাতে চামড়ার কালো একটা বড় ব্যাগ।

‘কারা?’ আপনমনে প্রশ্ন করল জ্যোতি।

মোকারম হোসেন শাগ করল। ‘কি জানি! আগে দেখিনি কখনও।’

ওদের বোটের গায়ে মৃদু ধাক্কা খেয়ে থেমে পড়ল ট্রলার। ওটার খালাসী এটার সাথে বেঁধে ফেলল নিজেদেরটাকে।

লোকটা মোকারম হোসেনের দিকে তাকিয়ে হাসল। ‘প্রফেসর সাহেবের সাথে দেখা করতে চাই। উনি আছেন?’

‘আছেন,’ মাথা ঝাঁকাল সে। ‘কিন্তু আপনারা?’

‘আমি সোনার বাংলা সার্কাসের মালিক, ইলিয়াস মোল্লা। ইনি আমার স্ত্রী।’ ওনার সাথে জরুরী একটা ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি।’

‘আসুন।’

এটায় চলে এল ইলিয়াস দম্পতি। মোকারম হোসেন তাদের নিয়ে বিজ্ঞানীর খুদে অফিসের দিকে চলল।

‘সার্কাসের মালিকের আবার কি দরকার পড়ল চাচাকে?’ সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল উপম।

‘নিশ্চয় জরুরী কিছু হবে,’ জ্যোতি বলল।

‘ঘটনা প্যাঁচ লেগে যায়নি তো?’

গাম চিবানোর ফাঁকে রাজা বলল, ‘দূর, বাদ দে! চল, আমরা রাজাকে খাইয়ে আসি।’

‘তাই চল,’ বলে আগে আগে চলল উপম।

জ্যোতি চলল বিজ্ঞানীর অফিসের দিকে। দরজা বন্ধ দেখে কি করবে ভাবছে, এমন সময় ইলিয়াস মোল্লার চাপা গলা শুনে থমকে গেল জ্যোতি। চোখ কপালে উঠল। বলে কি!

‘ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ, স্যার,’ বিজ্ঞানীকে থামিয়ে দিয়ে আবার বলে উঠল লোকটা। ‘কঠিন অবস্থা। শুধু সার্কাস দেখিয়ে পেট চালানো দিন দিন অসম্ভব হয়ে উঠছে। তাই একটা সাইড ব্যবসার কথা ভাবছি। আপনি যদি কষ্ট করে মৎস্যকন্যাটা ভয়ানক দুঃস্থ

ধরে—মানে, দাম নিয়ে কোন চিন্তা করবেন না। আপনি যা চান,
তাই দেব আমি।’

চোখ বড় হয়ে উঠল জ্যোতির চরম বিস্ময়ে। কি বলে মানুষটা?
মৎস্যকন্যা!

সাত

কল্পনার সেই মৎস্যকন্যা!

মানুষটার মাথা খারাপ হয়নি তো? মহিলার গলা শোনা গেল
এবার। ‘আমরা জানি, এখানেই কোথাও আছে সেই মৎস্যকন্যা।
অনেক জেলে দেখেছে ওটাকে। দয়া করে ধরে দিন, স্যার।
আমরা—’

পরের কথাগুলো ওর কানে গেল না। হাঁ করে বন্ধ দরজার
দিকে তাকিয়ে আছে। মৎস্যকন্যা!

এখানে!

এই সেন্ট মার্টিন দ্বীপে!

জ্যাস্ত!

উত্তেজনায বুকের মধ্যে খড়ফড় করে উঠল জ্যোতির। যদি

কথাটা সত্যি হয়, যদি ওটাকে এক পলক দেখার সুযোগ ঘটে, তাহলে—তাহলে—। মাথার মধ্যে সব গুবলেট হয়ে যেতে শুরু করল ওর। আর ভাবতে পারছে না।

ইচ্ছে করছে এখনই নেমে পড়ে সাগরে, কোথায় আছে মৎস্যকন্যা, খুঁজে বের করে। তাহলে সারাদেশে, না সারা পৃথিবীতে নাম ছড়িয়ে পড়বে জ্যোতির। সাংবাদিক আর টিভি ক্যামেরাম্যানরা ছায়ার মত লেগে থাকবে ওর পেছনে। সাক্ষাৎকার দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে—। কল্লনার তুফান মেল থামাল ও উপমের চাচার গম্ভীর গলা কানে পৌঁছতে।

‘ইলিয়াস সাহেব,’ বললেন তিনি, ‘ব্যাপারটা দয়া করে বোঝার চেষ্টা করুন। আমি বিজ্ঞানী, বাস্তবে বিশ্বাস করি, অবাস্তব কিছুতে নয়। আমার গবেষণা খুব উঁচুমানের। এই সমস্ত আজগুबी কথা আমি বিশ্বাস করি না, এবং এর পেছনে আমার মূল্যবান সময় নষ্ট করতেও রাজি না।’

‘আমিও তো এই কথাটাই আপনাকে বোঝাতে চাইছি, স্যার,’ বলল সার্কাসের মালিক। ‘অনর্থক আপনার একটা মিনিটও নষ্ট করতে চাই না আমি। আপনি ওটাকে ধরে দিন, তারপর যে সময় খরচ হবে, তার বিনিময়ে যে কোন একটা দাম বলুন, আমি সাথে সাথে দিয়ে দেব। আমাদের কাজও হবে, আপনারও দুটো পয়সা হবে।’

‘আমরা জানি,’ মহিলা বলে উঠল, ‘ওটাকে যদি কেউ ধরতে পারে, তো আপনিই একমাত্র পারবেন, স্যার। প্লীজ স্যার, আমাদের অনুরোধ ফিরিয়ে দেবেন না।’

‘আপনারা এত নিশ্চিত হলেন কি করে এই মৎস্যকন্যার ব্যাপারে?’ মোকারম হোসেনকে বলতে শোনা গেল।

‘জেনেগুনেই হয়েছে,’ বলল ইলিয়াস মোল্লা। ‘এখানকার এক জেলে খবরটা দিয়েছে আমাকে। সে নিজের চোখে ওটাকে দেখেছে কাছ থেকে। এই এলাকাতেই, দূরে কোথাও নয়। এই লেগুনেই।’

জ্যোতির হৃৎপিণ্ড আরেক লাফ দিল। এই লেগুনে!!

‘এরা অশিক্ষিত মানুষ,’ বললেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম। ‘কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। আসলে হয়তো স্বপ্নে মৎস্যকন্যা দেখেছে সে খোঁজ নিয়ে দেখুন ভাল করে। আমি সাগর নিয়ে গবেষণা করি। এমন আজব কথা কখনও শুনিনি।’

‘স্যার, শুধু একজনের মুখে শুনে এতদূর ছুটে আসিনি আমি। আরও কয়েকজন জেলের মুখেও শুনেছি। তারা প্রত্যেকে দেখেছে। এতজন মানুষের কথা মিথ্যে হতে পারে না, স্যার। ওটা দেখতে কেমন, সবার মুখে আলাদা আলাদা শুনেছি আমি। আশ্চর্য ব্যাপার, সবাই হুবহু একই বর্ণনা দিয়েছে ওটার।’

‘তাই নাকি?’ এবার একটু যেন আগ্রহ ফুটল বিজ্ঞানীর কণ্ঠে। ‘কি বলেছে তারা? দেখতে কেমন ওটা?’

‘চার ফুটের মত লম্বা,’ বলল সার্কাস মালিক। পেট থেকে ওপরের অংশ মানুষের, দশ-বারো বছরের মেয়ের মত। কোমর থেকে নিচেরটুকু মাছের লেজের মত। লেজটা চক্চকে সবুজ রঙের।

‘চুলের রঙ সোনালি,’ মহিলা বলে উঠল। ‘চক্চকে সোনালি।

জানি, শুনতে অদ্ভুত লাগছে, স্যার। কিন্তু অশিক্ষিত হলেও এতগুলো মানুষ ভুল দেখতে পারে না একই জিনিসকে। ওটার বর্ণনাও এক হতে পারে না। নিশ্চয় উল্টোপাল্টা হত তাইলে। অথচ তা হয়নি।’

অনেকক্ষণ কথা নেই কারও।

নাকি কথা হচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে না জ্যোতি? দরজায় কান ঠেকাল ও। না, কথা বলছে না কেউ।

‘ওটা দিয়ে কি করবেন বললেন?’ বেশ কিছু সময় পরে বিজ্ঞানীর চিন্তিত গলা শোনা গেল।

‘সাইড শো, স্যার,’ উদ্দীপ্ত স্বরে বলল সার্কাস কোম্পানির মালিক। ‘সার্কাসের সাথে ওটাও দেখাব আমার দর্শকদের, অতিরিক্ত দর্শনীর বিনিময়ে অবশ্য। এতে কিছু বাড়তি আয় হবে। সার্কাস কোম্পানির কর্মচারীদের বেতন-খাওয়ায় অনেক টাকা লাগে, স্যার। কুলিয়ে উঠতে পারি না। বর্ষাকালে তো রীতিমত বসে খাওয়াতে হয় এতগুলো মানুষকে। এর ওপর পশুগুলো তো আছেই। বাঘ, হাতি, ঘোড়া, কম নয় সব মিলিয়ে।’

‘হঁম!’

‘স্যার, আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব আপনাকে। দয়া করে মৎস্যকন্যাটাকে ধরে দিন।’

পঞ্চাশ হাজার!

জ্যোতি ভাবল, এতগুলো টাকার প্রস্তাব কি ফিরিয়ে দেবেন বিজ্ঞানী?

জবাব দিচ্ছেন না কেন উনি? এত কি ভাবছেন?

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

দরজায় হেলান দিয়ে আরও ভাল করে কান পাতল ও । ডক্টর
নেয়ামুল ইসলামের জবাব শুনতে আগ্রহী ।

আট

‘এত টাকা!’ চিন্তিত গলায় বললেন উপমের চাচা । অন্যমনস্ক ।
‘পঞ্চাশ হাজার তো বেশ টাকা । তবে—’

আবার ‘তবে’ কি? বিরক্ত হয়ে ভাবল জ্যোতি । সোজা কথাটা
সোজাসুজি বলে ফেললেই তো মামলা চুকে যায় ।

‘কি হলো, স্যার?’ উদ্বিগ্ন শোনাল ইনিয়াস সাহেবের গলা ।

‘বলছিলাম, মৎস্যকন্যারা যদি সত্যি থেকেও থাকে, ওটাকে
ধরার ব্যাপারে মনের সায় পাচ্ছি না আমি । কারণ ওটাকে বাঁচিয়ে
রাখা হয়তো সম্ভব হবে না আপনার পক্ষে ।’

‘আমি ওয়াদা করছি, স্যার, ওটার যত্নের ব্যাপারে কোন
রকম ক্রটি রাখব না আমি । মৎস্যকন্যার জন্যে আলাদা ব্যবস্থা
করব । বিশেষ ব্যবস্থা । সেজন্যে যত খরচ হয় হবে, পরোয়া নেই
আমার ।’

‘তাছাড়া আরও কথা আছে এখানে, স্যার,’ মহিলা বলে উঠল ।

‘কথা যখন জানাজানি হয়ে গেছে, আপনি না ধরলেও কেউ না কেউ ঠিকই ধরতে পারবে ওটাকে, কোন সন্দেহ নেই তাতে। হয়তো তাদের হাতেই মরবে ওটা শেষ পর্যন্ত।’

‘মনে হয় ঠিকই বলেছেন আপনি,’ বললেন ডক্টর ইসলাম।
‘অসম্ভব নয়। টাকাটা পেলে আমারও যথেষ্ট কাজে আসবে।’

‘তাহলে কাজটা আপনি করবেন?’ প্রশ্ন করল সার্কাসের মালিক।

বলে দিন হ্যাঁ, মনে মনে বলল জ্যোতি। হ্যাঁ, বলুন।

ওর একান্ত কামনা সত্যি হলো শেষ পর্যন্ত। ‘হ্যাঁ,’ বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। ‘সত্যিই যদি মতস্যকন্যা থেকে থাকে এখানে, আমি খুঁজে বের করব ওটাকে।’

‘ধন্যবাদ, স্যার,’ ফোঁস করে দম ছেড়ে বলল ইলিয়াস মোল্লা।
‘অনেক ধন্যবাদ। উফ! আপনি বাঁচালেন আমাকে, স্যার।’

মহিলার হাসি শোনা গেল। ‘আমার ধারণায় ভুল হয়নি তাহলে।
ঠিক জায়গাতেই এসেছি।’

‘আমরা কয়দিন পর খোঁজ নিতে আসব, স্যার। দেখে যাব এসে
কাজ কতদূর এগোল, কি বলেন?’

‘কয়দিনের মধ্যে হবে কি করে?’ মোকাররম হোসেন বলল
এবার।

‘হতেও তো পারে,’ বলল ইলিয়াস মোল্লা। ‘তবে একটা কথা,
এসব যেন গোপন থাকে। কেউ যেন না জানে আপনারা
মতস্যকন্যাকে খুঁজছেন, তাহলে সমস্যা হয়ে যেতে পারে।’

ঠিক তখনই ঘটে গেল ঘটনাটা। জ্যোতির দেহের পুরো ভার
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

সইতে পারল না আর অফিস রুমের দরজার ছিটকিনি, মড়াং করে
একটা আওয়াজের সাথে আচমকা খুলে গেল দরজা। হুড়মুড় করে
ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

নয়

চমকে উঠল ভেতরের সবাই। অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল।

‘কে!’ আঁতকে উঠল সার্কাসের মালিক। ‘কে তুমি!’ চেয়ার
থেকে উঠেই পড়ল লোকটা। মুখ হাঁ।

‘ইয়ে, মানে—’ আমতা আমতা করতে লাগল জ্যোতি।
বেকুবের মত তাকাল ভেতরের সবার দিকে। নাকমুখ জ্বলছে ওর।
লাল হয়ে উঠেছে গাল। ‘মানে এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ—’
আবার থেমে গেল।

‘মানে মৎস্যকন্যার কথা শুনে একটু দাঁড়িয়েছিলাম আর কি!’
সামলে নিয়ে বলল বিজ্ঞানীর দিকে তাকিয়ে।

অসহায় চোখে তাঁর দিকে ফিরল ইলিয়াস মোল্লা। ‘স্যার,
কথাটা আমি গোপন রাখতে চেয়েছিলাম।’

‘কোন চিন্তা করবেন না,’ অভয় দিলেন তিনি। ‘ও আমার

ভাইপোর বন্ধু। কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছে।’

‘এ আবার ফাঁস করে দেবে না তো?’ বলল মালিক-পত্নী।

‘না না, তা করবে না,’ ওকে দেখলেন বিজ্ঞানী। ‘কি বলো জ্যোতি, ব্যাপারটা কাউকে বলবে না তো?’

‘না,’ মাথা দোলান ও। ‘কাউকে বলব না। বলার প্রশ্নই আসে না।’

‘শুভ। উপম্ন আর রাজাকেও না, কেমন? গোপন কথা যত কান হয়, ততই আরও ছড়ায়, বুঝলে?’

‘জি,’ মনে মনে খুশি হয়ে উঠল জ্যোতি। এতবড় এক সাম্প্রতিক খবর শুধু ও-ই জানবে, আর কেউ না, ব্যাপারটা ভারি মজার মনে হলো। নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে লাগল।

স্ট্রীর দিকে তাকাল সার্কাসের মালিক। দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে তাকে। তাদের মনের অবস্থা বুঝতে কষ্ট হলো না জ্যোতির।

‘আপনারা ভাববেন না,’ চাচার সহকারী আশ্বস্ত করতে চাইল তাদের। ‘ও যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছেলে। কাউকে বলবে না।’

খানিকটা দ্বিধা কাটল তাদের। ‘আচ্ছা,’ মহিলা বলল।

টেবিলের ওপর থেকে চামড়ার ছোট ব্যাগটা তুলে নিল ইলিয়াস মোন্না। উঠে দাঁড়াল। ‘এবার তাহলে চলি আমরা। কয়দিন পরে আসব।’

‘ঠিক আছে,’ অফিসের দরজা পর্যন্ত তাদের এগিয়ে দিলেন বিজ্ঞানী।

জ্যোতিও বেরিয়ে এল। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে ট্রলারের চলে যাওয়া দেখল। মাথায় গিজ্‌গিজ্‌ করছে অন্যরকম পরিকল্পনা।

গভীর রাত । সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ।

সাবধানে বিছানা ছাড়ল জ্যোতি, পা টিপে টিপে কেবিন ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল । যখন নিশ্চিত হলো কেউ টের পায়নি ব্যাপারটা, আশ্বস্ত করে পানিতে নেমে পড়ল । নিঃশব্দে লেগুনের দিকে সাঁতরাতে লাগল ।

কিছুদূর গিয়ে ঘুরে তাকাল ও । নাহ, কাউকে দেখা যাচ্ছে না । ঘূমে বেহঁশ সবাই । বোটের নাক থেকে লেজ পর্যন্ত গাঢ় অন্ধকারে ডুবে আছে ।

আকাশে গোল থালার মত চাঁদ ভাসছে, অনেকদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায় । সহজ ভঙ্গিতে সাঁতরে চলল জ্যোতি, সাবধানে রীফ ঘুরে লেগুনের দিকে সাঁতরে চলল ।

রীফ ছাড়িয়ে এসে গতি কমাল ও ।

চোখ কুঁচকে এদিক-ওদিক তাকাল । মৃদু দোল খাচ্ছে দেহ । ওর তৈরি ছোট ছোট টেড চাঁদের আলোয় চিক্‌চিক্‌ করছে অজস্র হীরের মত । অসম্ভব সুন্দর একটা দৃশ্য ।

কোথায় আছে মৎস্যকন্যা? ভাবল জ্যোতি । কোথায়? কতদূরে?

মন বলছে এখানেই কোথাও আছে । কাছেপিঠেই । ওটাকে যে খুঁজে বের করবে জ্যোতি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই ।

পানির নিচে, অনেক গভীরে মেঘ ডাকার মত আওয়াজ হলো ।

থেমে গেল জ্যোতি, কান খাড়া করে আওয়াজটা কিসের বোঝার চেষ্টা করল । ক্রমে বাড়ছে ওটা ।

কিসের শব্দ?

এক নাগাড়ে গুম্‌গুম্‌ করছে, থামছে না। কমছেও না। বহুদূরে
মেঘ ডাকলে যেমন শব্দ হয়, ঠিক তেমনি।

মেঘ ডাকছে, না ভূমিকম্প হচ্ছে? ভাবল ও। সাগরের নিচেও
ভূমিকম্প হয়। এই শব্দটা কি—

ঢেউগুলো পরস্পরের সাথে বাড়ি খেয়ে অস্থির করে রেখেছে
ওপরটা; নিজেকে সোজা রাখতে কষ্ট হচ্ছে জ্যোতির।

‘কি হচ্ছে এসব?’ বিড়বিড় করে নিজেকে প্রশ্ন করল ও।

হঠাৎ করে লেগুনের ঠিক মাঝখানে বিশাল এক ঢেউ মাথা
তুলল, উঁচু হতে লাগল ক্রমেই। দেখতে দেখতে পাহাড়ের মত বড়
হয়ে উঠল।

আঁতকে উঠল ও, জলোচ্ছ্বাস নাকি?

না, তার তো ঢেউ থাকে। একের পর এক ঢেউ তীরে এসে
আছড়ে পড়ে জলোচ্ছ্বাসের সময়। আবহাওয়া প্রচণ্ডরকম খারাপ
থাকে। এখন তো একদম স্বাভাবিক আছে আবহাওয়া।

তাহলে?

হঠাৎ ভেঙে পড়ল ওটা। গাড়ি রঙের একটা বিশাল কিছু মাথা
তুলল ওখানটায়। সাগর-দানব!

ওটার অদ্ভুত দেহ বেয়ে বৃষ্টির মত ঝরঝর করে পানি বেয়ে
পড়ছে। এক চোখ জিনিসটার—বড়। গুঁড় আছে অনেকগুলো! শূন্যে
সাপের মত লকলক করছে ওগুলো, কিল্‌বিল্‌ করছে।

চিৎকার করে উঠল জ্যোতি। চোখে পলক পড়ল সাগর-
দানবের। পিটপিট করে উঠল পিরিচের মত বড়, বাদামী রঙের

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

চোখটা । ঘুরে বোটের দিকে সাতরাতে চাইল জ্যোতি । হলো না ।

চাবুকের মত বাতাসে শিস কেটে ছুটে এল ওটার কয়েকটা
গুঁড়, আষ্টেপৃষ্ঠে পৌঁচিয়ে ফেলল জ্যোতিকে ।

একটা গলায় এঁটে বসল । চাপ দিল ।

দম আটকে এল ওর ।

দশ

‘আমি—আমি দম নিতে পারছি না!’ কোনমতে বলল জ্যোতি ।

গলায় পৌঁচিয়ে বসা গুঁড় ছাড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ।
‘বাঁচাও! কে আছ মরে গেলাম!’

হঠাৎ চোখ মেলল ও । বোকার মত ওপরের কাঠের সিলিঙের
দিকে তাকিয়ে থাকল ।

বোটেরই আছে জ্যোতি ।

নিজের বিছানায় ।

বোকা বোকা লাগল নিজেকে । লম্বা করে দম নিল ও । বুকের
ধুকপুকুনি কমার অপেক্ষায় থাকল । ওটা তাহলে স্বপ্ন ছিল?

দু’হাতের চেটো দিয়ে চোখ ডলল জ্যোতি । উঠে বসল, মাথার

কাছের ছোট জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। পূব আকাশে সবে সূর্য উঠতে শুরু করেছে। লাল হয়ে আছে আকাশ। সাগর একদম শান্ত।

রীফের ওপাশের লেগুনের দিকে তাকাল জ্যোতি। ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, নিজেকে শোনাল মনে মনে। ওটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। স্নেফ একটা স্বপ্ন। বা দুঃস্বপ্ন।

মাথা ঝাঁকাল ও জোরে জোরে, ব্যাপারটা ভুলে যাবার চেষ্টা করল। এখন ওকে ভয় পেলো চলবে না। ওকে সাগরে নামতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে মৎস্যকন্যাকে। করতেই হবে।

কেউ জেগেছে ঘুম থেকে, রাজা বা উপম? বেশি জোরে টেঁচিয়েছে নাকি জ্যোতি? না বোধহয়। কান খাড়া করে শুয়ে থাকল। না, কোন শব্দ নেই পানির মৃদু ছলাৎ ছল ছাড়া। একদম নীরব। সাবধানে নিজের সঁতারের স্যুট পরে নিল জ্যোতি, শব্দ করে কারও নজর কাড়তে চায় না।

পা টিপে বেরিয়ে এল কেবিন ছেড়ে। কান খাড়া করে রাখল কিছু সময়। নাহ, কারও সাড়া নেই। ডুব দেয়ার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে ওপরে উঠে এল জ্যোতি। ফাঁকা। কেউ নেই। তবে উপমের চাচা হয়তো জেগে গেছেন, খুঁদে গবেষণাগারে তাঁর মৃদু কাশির শব্দ শোনা গেল মনে হয়।

পেছনে এসে তাড়াতাড়ি, তবে নিঃশব্দে মাস্ক, ফ্লিপার, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ইত্যাদি পরে নিল। তারপর মই বেয়ে নেমে পড়ল পানিতে।

এভাবে চোরের মত সাগরে ডুব দেয়া পছন্দ হচ্ছে না জ্যোতির, কিন্তু উপায় কি? মৎস্যকন্যাকে দেখার জন্যে অস্থির ও, শান্তি নেই

তার আগে পর্যন্ত। কাজেই কি করার আছে? সবার আগে জীবন্ত
এক মৎস্যকন্যাকে খুঁজে বের করা যা-তা কথা নাকি? তাছাড়া কেউ
জেনে ফেললে ওকে একা নামতে দেবে সাগরে?

দেবে না। অতএব—

ধীরগতিতে, পানিতে বেশি শব্দ না তুলে লেগুনের দিকে
এগোতে থাকল জ্যোতি। মনে মনে মৎস্যকন্যা দেখতে কেমন,
কল্পনা করছে।

ইলিয়াস মোন্নার স্ত্রী বলেছে, ওটার পেট থেকে ওপরের অংশ
নাকি মানুষের মত। কিশোরী মেয়েদের মত। পিঠ পর্যন্ত লম্বা,
চক্চকে সোনালি চুল আছে মাথায়। আর কোমরের নিচের অংশ
মাছের মত। সবুজ রঙের লেজ।

কি অদ্ভুত কথা!

অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মাছ?

এ-ও কি সম্ভব?

নিচে তাকাল জ্যোতি। নিজেকে লেজওয়ালা মৎস্যকন্যার মত
কল্পনা করার চেষ্টা করল। হলে মন্দ হত না। অলিম্পিকে অংশ নেয়া
যেত বিনা প্র্যাকটিসে।

মৎস্যকন্যা কি সুন্দরী? ভাবল ও। তিয়ানার মত? কথা বলতে
পারে ওটা? পারলে ভাল হয়। ওর মুখ থেকে তাহলে সাগরতলের
অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবে জ্যোতি।

ও দম নেয় কি করে পানির তলায়?

কিসের মত চিন্তা করে মৎস্যকন্যা? মানুষের মত, না মাছের
মত? একটার পর একটা প্রশ্ন মনে উঁকি দিতে থাকল।

এবারেরটা ওর জীবনের সেরা অভিযান হতে যাচ্ছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই জ্যোতির। আরও বিখ্যাত হয়ে যাবে ও। তারপর—ঢাকায় ফিরে এ-নিয়ে একটা বই লিখে ফেলবে। কি নাম দেবে বইটার? হ্যাঁ, ‘পাতালপুরির রহস্য’। দারুণ হবে। হয়তো একদিন ওটার কাহিনী নিয়ে ছবিই বানিয়ে ফেলবে কেউ। ‘জুরাসিক পার্ক’ বা ‘গডজিলার’ মত-জ্যোতির ‘পাতালপুরির রহস্যও’ বিখ্যাত ছবি হবে, সারা দুনিয়ায় নাম ছড়িয়ে পড়বে ওর।

মুখ তুলে সামনেই ফায়ার কোরালের রীফ দেখতে পেল ও। ঘুরে ওটাকে পাশ কাটাল। একবারই যথেষ্ট, আর ওই জিনিসের কাছে যেতে রাজি নয় ও। কথায় বলে না, ন্যাড়া একবারই বেলতলায় যায়।

রীফ পেরিয়ে ওপাশে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠল জ্যোতি। দেরি সহ্য হচ্ছে না। এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে একটু আগের স্বপ্নটার কথা বেমানাম ভুলে গেল।

সাবধানে পা ছুঁড়ছে জ্যোতি, রীফ প্রায় পেরিয়ে এসেছে, হঠাৎ কি যেন একটা ঘষা খেল ওর পায়ের সাথে।

চমকে উঠল জ্যোতি, বেখেয়ালে এক ঢোক লবণাক্ত পানি গিলে ফেলল। কেশে উঠল গলায় অস্বাভাবিক লবণের বিশ্বাস অনুভব করে, পা ছুঁড়তে লাগল। টের পাচ্ছে কিছু একটা পায়ের গোড়ালিতে চেপে বসতে শুরু করেছে।

জায়গাটা চুলকাল জ্যোতি।

এবং মুহূর্তে বুঝে ফেলল, ওটা আর যা-ই হোক, সামুদ্রিক উদ্ভিদ নয়। উদ্ভিদের খাবা নেই। থাকে না।

এগারো

রক্ত জমানো আতঙ্ক অগ্রাহ্য করে অন্য পায়ে গায়ের জোরে এক লাথি ছুঁড়ল জ্যোতি। লেগেছে! খুশি হয়ে উঠল ও, জিনিসটা যা-ই হোক, ভালই—আবার পা ছুঁড়ল। পরক্ষণে চোখ কপালে উঠল একটা চিৎকার শুনে।

‘থাম্! উহ্, লাগছে!’

কে রে? ভাবল জ্যোতি। মৎস্যকন্যা নাকি?

আচমকা মুখের সামনেই পানি ফুঁড়ে লাফিয়ে উঠল উপমের মাঝ পরা মুখ। রেগে উঠল জ্যোতি। ‘তুই!’

মাঝ ঠেলে কপালে তুলে চোখ কুঁচকে তাকাল ও। ‘লাথি মারলি কেন? আমি তো শুধু পা ছুঁয়েছি তোরা!’

‘কিন্তু তুই এখানে কেন?’ চেষ্টা করে উঠল জ্যোতি। রেগে গেছে।

‘তুই এখানে কেন, আগে তাই বল,’ উপমও রেগে উঠল। ‘চাচা না সবাইকে নিষেধ করে দিয়েছেন এদিকে আসতে?’

‘তারপরও কেন এসেছিস তুই?’

‘তুই কেন এসেছিস জানতে,’ গম্ভীর হয়ে উঠল উপম। ‘আমি

জানি কিছু একটা মতলব আছে তোরা।’

‘কোন মতলব নেই,’ ওকে কাটাবার চেষ্টা করল জ্যোতি।
‘কিসের মতলব? এমনিই সাঁতার কাটতে এসেছি।’

‘বুঝি বুঝি। অঙ্ককার কাটতে না কাটতে একা সাঁতারাবার শখ হয়েছে তোমার, তাই না? তাও যেখানে আসা নিষেধ, ঠিক সেখানেই। কাল না এখানেই কোরালে লেগে তোর পায়ের দফারফা হয়েছিল?’ মাথা ঝাঁকাল উপম। ‘হুঁ হুঁ বাওয়া! তুই আমাকে এত বোকা মনে করিস?’

ভেতরের রাগ দমন করল জ্যোতি অনেক কষ্টে। অসহায় বোধ করল। ভারি মুশকিলের কথা হলো তো! উপম সাথে লেগে থাকলে আসল কাজ কিভাবে করবে ও?

আর যা-ই হোক, মৎস্যকন্যার কথা ওকে বলতে পারে না জ্যোতি। কিছুতেই না। কাউকেই বলা যাবে না।

‘ঠিক আছে,’ প্রধান বলল। ‘তোরা যা খুশি ভাবতে পারিস। মনে কর তুই নয়, আমিই বোকা।’

হাসল উপম। ‘স্বীকার করিস তাহলে? ওড বয়। এখন চল, আমাদের দেখতে না পেলে নিশ্চয় চাচা রেগে উঠবেন।’

‘তুই যা। আমি কিছুক্ষণ সাঁতরে আসছি।’

‘জ্যোতি, চাচা কিন্তু সত্যি রাগ করবেন এবার। তোর জন্যে ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে আমার, আর কখনও তাঁর সাথে সাগরে বেড়াবার কথা মুখেও আনবেন না চাচা। জলদি চল।’

ঠিকই তো, ও ভাবল। সত্যিই তাহলে কখনও এমন অভিযানে আসা হবে না ওদের। ফিরেই যাবে ঠিক করল জ্যোতি, এমন সময়

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

চোখের কোণ দিয়ে পানিতে একটা আলোড়ন দেখতে পেল।
রীফের অন্য পাশে।

মৎস্যকন্যা! ঠিক তাই, না হয়েই পারে না। এখনই যেতে হবে
ওখানে, নইলে আর দেখা পাওয়া যাবে না জিনিসটার। ঘুরে সাঁতার
শুরু করল জ্যোতি, খুব জোরে।

‘জ্যোতি!’ উপম পেছনে চেষ্টায়ে উঠল। ‘জ্যোতি, ফিরে আয়!’
ওর গলার স্বরে কি যেন একটা ছিল। কি, আতঙ্ক? যা খুশি
হোক গে, আমি পরোয়া করি না।

এগিয়ে চলল জ্যোতি।

আবার ডাকল উপম। ‘জ্যোতি! জ্যোতি!!’

পাত্তাই দিল না হরর ক্লাব প্রধান।

কিন্তু দেয়া উচিত ছিল। একটু পর ব্যাপারটা বুঝল জ্যোতি।
কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে।

বারো

এগোবার ফাঁকে মুখ তুলে সামনে তাকাল জ্যোতি। আবার চোখে
পড়ল আলোড়ন। নিশ্চয় ওটা সেই মৎস্যকন্যা! নিশ্চয় তাই!

চোখ কুঁচকে ওটাকে দেখার চেষ্টা করল ও। আনন্দে মন নেচে উঠল। ওই তো! ওই তো ওটা; পানির ওপর পলকের জন্যে মৎস্যকন্যার ফিন দেখতে পেরেছে জ্যোতি।

ডুব দিয়ে ব্যস্ত হয়ে সামনে নজর বোলাবার চেষ্টা করল ওটার খোঁজে, কিন্তু মাঝ রূপসা হয়ে পড়েছে বলে দেখা গেল না কিছুই।

ধুত্তোর! ঝামেলা বাধার সময় আর পেল না? ওপরে উঠে মাঝ খুলে দম নিল জ্যোতি। আলোড়ন যেখানটায় দেখা গেছে, সেদিকে কড়া নজর। যেন হারিয়ে না যায় জায়গাটা।

চোখের পানি মুছে ফের এগোল ও।

এবং তখনই চোখ পড়ল জিনিসটার ওপর। মাত্র কয়েকশো গজ সামনে পানিতে পিঠ জাগিয়ে ভাসছে।

কিন্তু মৎস্যকন্যা নয় জিনিসটা।

হাঙর!

হামারহেড বা হাতুড়ি মাথা হাঙর!

মাথার দু'পাশে প্লেনের ডানার মত বেরিয়ে আছে বেশ খানিকটা। শিকার ধরার অস্ত্র। ওই দিয়ে হাতুড়ির মত ভয়ঙ্কর বাড়ি মেরে শিকার ধরে ওরা। ধূসর-সাদা রঙের অতিকায় এক এক্সপ্রেস ট্রেনের মত ছুটে এল হাঙরটা। পিঠের তেকোনা ফিন ছুরির মত পানি কেটে এগিয়ে আসছে।

তেরো

উপম কোথায় গেল? আছে ওর পেছনে?

ঘুরে তাকাল জ্যোতি। হতাশ হলো। না, আসছে না, বোটের দিকে ফিরে যাচ্ছে। বেশ দূরে গেছে এর মধ্যে।

ওর কথা ভুলে হাঙরটার দিকে নজর দিতে বাধ্য হলো জ্যোতি, বেশ দ্রুত এগিয়ে আসছে দানব।

জোরে জোরে হাত-পা ছুঁড়ল জ্যোতি, সরে যেতে চাইছে ওটার সামনে থেকে। কিন্তু তেমন কোন লাভ হলো না।

হঠাৎ উপমের চাচার সতর্কবাণীর কথা খেয়াল হতে থেমে গেল। তিনি বলেছিলেন, আশেপাশে হাঙর থাকলে পানিতে বেশি আলোড়ন করতে নেই, তাতে বরং ওগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। স্থির হয়ে গেল জ্যোতি।

কাজ হবে? ওটা কি রেহাই দেবে ওকে?

ভীত-কম্পিত হৃৎপিণ্ড গলার কাছে উঠে এসেছে জ্যোতির, আটকে গেছে। ঘুরে উল্টোদিকে এগোতে শুরু করল ও, বোটের দিকে যেতে চাইছে। দানবটার নাগালের বাইরে চলে যেতে চায়।

ওটার ভেসে থাকা ফিনের দিকে তাকাল।

ঘুরছে বড় একটা বাঁক নিয়ে, এমুখো হয়েছে তেকোনা ফিনটা।
এবার সোজা এদিকেই আসছে।

ভয়ে গুঁড়িয়ে উঠল জ্যোতি। অনেক কাছে এসে পড়েছে
ভীতিকর রাক্ষসটা, ওর চারদিকে ঘুরতে শুরু করেছে।

ফেসে গেছে জ্যোতি। সরে যাওয়ার পথ নেই এখন। ওর আর
বোটের মাঝখানে চক্কর খাচ্ছে হাঙর, ওদিকে যাওয়ার উপায় নেই।
বাঁচার একটাই মাত্র রাস্তা আছে এখন, সোজা কোরাল রীফের ওপর
উঠে যাওয়া।

ফিন আরও কাছে চলে আসছে। বৃত্ত ছোট করে আনছে দানব।

ফায়ার কোরালের কথা ভাবল জ্যোতি। কিন্তু উপায় নেই,
বাঁচতে হলে এখন ওদিকেই যেতে হবে। তাই করল ও। ওদিকে
হাঙর একটু একটু করে আরও ছোট করে এনেছে তার চক্করের
পরিধি।

ভয়, উত্তেজনা আর পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেছে ও। দম নিচ্ছে
ছোট করে, ঘন ঘন। মাথার মধ্যে একটাই শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে।
হাঙর! হাঙর!!

আরও কাছে এসে পড়ল ওটা। দীর্ঘ লেজ দিয়ে পানিতে বাড়ি
মারছে। ছিটকে নাকেমুখে এসে পড়ছে পানি।

আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখে ওটার দিকে সম্মোহিতের মত
তাকিয়ে আছে জ্যোতি। এত কাছে এসে পড়ছে যে ওটার কুতকুতে
দুঁচোখ পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে। মাথার দুঁদিকে প্লেনের ডানার মত
দুই হাতুড়ির ওপর চোখ পড়তে ঢোক গিলল। ওটা দিয়ে যদি বাড়ি

মেরে বসে এখন হ্যামারহেড, কি অবস্থা হবে ওর?

কম করেও সাত ফুট লম্বা হবে ওটা, জ্যোতির প্রায় দ্বিগুণ।
হাতুড়ির মাথায় বসানো দু'চোখে কেমন এক ঘোর লাগানো চাউনি।

অস্ফুটে কিছু বলে উঠল জ্যোতি। কি বলল, নিজের কান পর্যন্ত
পৌছাল না। পায়ে ঠাণ্ডা কিছুর স্পর্শ লাগল।

হাঙর!

শূন্য পাকস্থলী লাফিয়ে উঠল পেটের মধ্যে। পানির ওপর মুখ
তুলে সমস্ত শক্তি এক করে চিৎকার করে উঠল জ্যোতি।

মেরুদণ্ডের ওপর দড়াম করে কিছু একটা আছড়ে পড়ল, অসহ্য
ব্যথায় চোখে আঁধার দেখল ও।

নাক দিয়ে গুঁতো মারছে হ্যামারহেড। তাও ভাল নাক দিয়ে,
হাতুড়ি দিয়ে মেরে বসলে হয়েছিল কাজ।

তবু ভয়ে জমে গেল জ্যোতি। হাঙরটা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত।

গুঁতো মেরেই পিছিয়ে গেল ওটা, নতুন করে চক্কর শুরু করল।
কয়েক চক্কর দিয়েই আচমকা ব্রেক কষল, তারপর সোজা খেয়ে এল
ওর দিকে।

প্রকাণ্ড মুখ হাঁ হয়ে আছে, ভেতরে ঝকঝক করছে দুই সারি
ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণধার দাঁত।

আবার গলা ছেড়ে চিৎকার করে উঠল জ্যোতি। পানিতে হাত-
পায়ের প্রচণ্ড ঝাপটা মেরে খানিকটা সরিয়ে আনল নিজেকে।

এবং বেঁচে গেল। অল্পের জন্যে ওর ডান পায়ে কামড় বসাতে
পারল না ওটা। জ্যোতির গায়ে গা ঘেঁষে রকেটের বেগে ছুটে গেল
সামনে।

রীফ! রীফে পৌছতে হবে আমাকে, ভাবল জ্যোতি মরিয়া হয়ে। নইলে বাঁচা যাবে না। ওটাই এখন বাঁচার একমাত্র পথ।

প্রাণপণে সেদিকে সাতরাতে শুরু করল ও, একই মুহূর্তে হাঙরটাও আরেকবার হামলা চালাল। কিন্তু অল্পের জন্যে মিস করল এবারও।

কাছে এসে থাবা দিয়ে কোরাল রীফের কর্কশ, তীক্ষ্ণধার গা মুঠো করে ধরল জ্যোতি। মুহূর্তে তীব্র যন্ত্রণার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সারা দেহে, ফায়ার কোরালের স্পর্শে আগুন ধরে গেল হাতে। কিন্তু পাত্তা দিল না ও।

ঠেলেঠেলে রীফের ওপর উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল। প্রায় উঠেই পড়েছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এক পা পিছলে পানিতে পড়ল। সাথে সাথে কেউ যেন ঘ্যাঁচ করে ছুরি গেঁথে দিল ওটায়।

হাঙর!

কামড়ে ধরেছে জ্যোতির পা!

চোদ্দ

পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত অসহ্য ব্যথার ঢেউ একের পর

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

এক আছড়ে পড়ছে। পায়ে টান খেয়ে হুড়মুড় করে পানিতে পড়ে গেল ও।

গায়ের সব শক্তি শেষে নিয়েছে কে যেন।

এই সময় কাছেই জোর ঝপাৎ শব্দ উঠল পানিতে। সাথে সাথে পায়ের ওপর থেকে হাঙরটার দাঁত সরে গেল, ঝট করে ঘুরে গেল ওটা পেছনদিকে।

জ্যোতি সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইল, ক্রান্তি ভুলে রীফে হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে যাওয়ার চেষ্টা করল।

ওদিকে ফের হাঁ করে ছুটে আসতে শুরু করেছে হাঙর। সময় শেষ, বুঝতে পারছে জ্যোতি পরিষ্কার। কিছু করার উপায় নেই। আরেকটা চিংকার বেরিয়ে এল গলা চিরে। চোখ বুজে ফেলল সভয়ে। জানে, এখনই একটা পা হারাতে চলেছে।

কিন্তু—এক সেকেন্ড কেটে গেল। তারপর আরেক সেকেন্ড।

কিছু ঘটছে না।

কেন? ব্যাপার কি?

কাছেই জোর এক ঝপাৎ শব্দ শুনে চোখ খুলল জ্যোতি। পানিতে তুমুল আলোড়ন চলছে। ওর আর হাঙরটার মাঝখানে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। জ্যোতির কয়েক ফুট দূরে।

কি ওটা?

তাকিয়ে থাকল ও। আবার জোর আলোড়ন উঠল, হঠাৎ করে একটা গাঢ় সবুজ রঙের লেজ ভেসে উঠল পানির ওপর। পর মুহূর্তে আছড়ে পড়ল পানিতে জোরাল চড়ের মত চটাশ শব্দে।

আরেকটা মাছ! চমকে উঠল জ্যোতি।

হ্যামারহেডের সাথে লড়াই করছে আরেকটা মাছ!

কি আশ্চর্য!

কি মাছ ওটা?

একটা পাক খেল হাঙর, এগিয়ে এল। আবার উঠল সবুজ লেজটা, ঠাস করে আছড়ে পড়ল ওটার মাথার ওপর। তলিয়ে গেল হ্যামারহেড।

কি ঘটছে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে না জ্যোতি। ভীষণ রকম ওলট-পালট চলছে পানিতে। বড় বড় ঢেউ উঠছে ওখানটায়। পানি আর ফেনা বারবার হিটকে এসে ওর চোখেমুখে লাগছে। ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে সামনের সবকিছু।

একটু একটু করে বাড়তেই থাকল পানির আলোড়ন। সাদা ফেনা, বুদ্ধ, ঢেউ আর চটাশ চটাশ আওয়াজে সরগরম হয়ে উঠেছে সামনের খানিকটা জায়গা।

হঠাৎ সব ছাপিয়ে একটা জান্তব, তীক্ষ্ণ বাঁশির মত চিৎকার শুনতে পেল জ্যোতি। কি ওটা? হাঙর? হাঙর চিৎকার করে? নাহ। তাহলে?

ভেসে উঠল হ্যামারহেড। প্রকাণ্ড চোয়াল হাঁ হয়ে আছে হিংস্র ভঙ্গিতে। অদৃশ্য কিছু একটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করছে যেন ওটা। বাতাসে কামড় বসাল একবার, দু'বার। দাঁতে দাঁতে বাড়ি খেয়ে খটখট আওয়াজ উঠল।

সবুজ মাছের লেজটা আবার মাথাচাড়া দিল শূন্যে, বিকট চড়াং শব্দে আছড়ে পড়ল ওটার মাথার ওপর।

হপ্ করে মুখ বুজে ফেলল হাঙর, ডুব দিল। আরেকটা ঝাপাং

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

শব্দ উঠল। তারপর নীরব হয়ে গেল সব। পানির আলোড়ন থেমে এল।

একটু পর জ্যোতির কয়েক ফুট দূরে দেখা দিল হাঙরের বড়সড় তেকোনা ফিন। তীরবেগে ছুটে পালাচ্ছে।

হাঙর পালাচ্ছে! খুশিতে, বিস্ময়ে বোকা বনে গেল জ্যোতি।

কিন্তু ওদিকে নজর দেয়ার সময় নেই। এদিকে সবুজ মাছের লেজটা আবার দেখা দিয়েছে শান্ত পানির ওপর। অল্প জায়গা নিয়ে ঘুরছে।

একটা চাপা, সুরেলা আওয়াজ উঠল কাছেই কোথাও। চমৎকার মিষ্টি গলায় কে যেন গান গাইছে। গলা চমৎকার, কিন্তু সুরটা বিষাদের। গুন্‌গুন্‌ করছে, একই সাথে তীক্ষ্ণ শিসও বাজাচ্ছে।

কে!

অনেকটা তিমি মাছের ডাকের মত। কিন্তু তিমি কোথেকে আসবে এখানে? ভাবনাটা শেষ হলো না, ভয়ানক এক ঝাঁকি খেয়ে চমকে উঠল জ্যোতি। লেজটা ডুবে গেছে, তার জায়গায় মাথা তুলেছে আর কিছু।

একটা মাথা! লম্বা, চক্‌চকে সোনালি চুলে ভরা।

মৎস্যকন্যা!!!

পনেরো

ফায়ার কোরালের জ্বালা যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল জ্যোতি, আহাম্মকের মত হাঁ করে তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে।

দেখল জ্যোতি, সার্কাসের মালিক যেমন বলেছিল, ওটা ঠিক তেমনি দেখতে। খুবই মিষ্টি চেহারা ওটার। হরিণের মত বড়, টানা দুটো চোখে রাজ্যের মায়া। সাগরের পানির মত সবুজ রঙের চোখ। চক্‌চক্‌ করছে দৃষ্টি। গায়ের চামড়া হালকা গোলাপী রঙের। মসৃণ।

মাথা একটু ছোট জ্যোতির তুলনায়, কাঁধও। তবে লেজ যথেষ্ট লম্বা, এবং শক্তিশালী।

হাঁ করে তাকিয়েই থাকল ও। ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

পেল অনেকক্ষণ পর। কোনমতে বলল, ‘তুমি—তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছ। কি বলে যে ধন্যবাদ জানাব—।’

মনে হলো লজ্জা পেয়েছে মৎস্যকন্যা। গাঢ় গোলাপী ঠোঁট গোল করে বলল কি যেন, বুঝতে পারল না জ্যোতি।

‘বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি,’ বলল ও। ‘তুমি যা বলবে, তাই করব আমি।’

হাসল ওটা, মৃদু গুঞ্জনের মত অপার্থিব একটা আওয়াজ করল
গলা দিয়ে। কি যেন বলছে নিজের ভাষায়। ইস্, যদি বুঝতে
পারতাম! ভাবল ওন।

কাছে চলে এল মৎস্যকন্যা। রেড কোরালে ক্ষত-বিক্ষত হাতটা
তুলে নিল নিজের নরম, ঠাণ্ডা হাতে। চোখ কুঁচকে ক্ষতগুলো
দেখল। একটা হাত আলতো করে তার ওপর দিয়ে বুলিয়ে নিল
ওটা। সাথে সাথে অবাক হয়ে খেয়াল করল জ্যোতি, জ্বালা-পোড়া
কমে যেতে শুরু করেছে।

‘আরে!’ বিস্ময়ে চোঁচিয়ে উঠল ও। বুঝতে পারছে কাজটা
বোকার মত হয়ে গেছে, কিন্তু এ-ছাড়া আর কিছু করার কথা
মাথায়ই আসেনি। জাদু আছে নিশ্চয় মৎস্যকন্যার স্পর্শে।
ছোঁয়ামাত্র ব্যথা-যন্ত্রণা গায়েব! চিন্তাই করা যায় না।

ও কি সত্যি?”

যা ঘটছে এখন, তা কি সত্যি?

না স্বপ্ন?

চোখ জোরে টিপে কিছুক্ষণ বন্ধ রাখল জ্যোতি। তারপর
মেলল। হ্যাঁ, আছে মৎস্যকন্যা। উধাও হয়ে যায়নি।

তার মানে এসব সত্যি। মৎস্যকন্যা সত্যি।

আবার মাথা দোলাল ওটা। কাঁচা রোদ লেগে চিক্‌চিক্‌ করে
উঠল এক মাথা সোনালি চুল। কিছু বলার চেষ্টা করল সুরেলা,
দুর্বোধ্য ভাষায়।

জ্যোতির বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে যে একটু আগে এক ক্ষুধার্ত
হাঙরের সাথে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সংগ্রাম করছিল ও।

চোখ তুলে চারদিকে তাকাল। কোথাও চিহ্ন নেই দানবটার।
পানি শান্ত, ভোরের রোদ মেখে সোনার মত রঙ পেয়েছে। যতদূর
দেখা যায় জ্যোতি আর মৎস্যকন্যা ছাড়া কিছুই নেই।

সত্যিকারের মৎস্যকন্যা!

অবিশ্বাস্য!

কেউ বিশ্বাস করবে না ওর আজকের এই আবিষ্কারের কথা।
উপম আর রাজার তো প্রশ্ন আসে না। হেসেই উড়িয়ে দেবে ওরা।
পাগল আখ্যা দেবে জ্যোতিকে, নয়তো মিথ্যুক।

ইঠাং পানিতে লেজ দিয়ে বাড়ি মারল ওটা, চোখের পলকে
অদৃশ্য হয়ে গেল। গতি দেখে অবাক হলো জ্যোতি।

চারদিকে তাকাতে লাগল। সামান্যতম আলোড়ন নেই
পানিতে, একটা বুদ্বুদও নেই, অথচ মৎস্যকন্যা হাওয়া। কোথায়
গেল? আর কি দেখা পাবে জ্যোতি ওটার? চোখ ডলে আবার
এদিক-ওদিক তাকাল।

না, কোন চিহ্ন নেই ওটার। কিছু রঙচঙে মাছ ওর পাশ ঘেঁষে
চলে গেল সুড়ুং করে।

জ্যোতি ভাবতে লাগল আসলেই ও মৎস্যকন্যাকে দেখেছিল
কিনা। ইঠাং ডান পায়ে একটা খোঁচা লাগতে চমকে উঠল। ‘উহ্!’
হাঙরটা ফিরে এসেছে ভেবে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। আতঙ্কিত হয়ে
পড়েছে।

এমন সময় পেছনে পানির হুল্হুল শব্দ উঠল। বাঁশির মত তীক্ষ্ণ
কণ্ঠে হাসল কেউ। চোখ কুঁচকে উঠল জ্যোতির। ঘুরল দ্রুত।

আরে! মৎস্যকন্যা!

হাসছে খিলখিল করে, দুই আঙুলে চিমটি কাটার ভঙ্গি করছে।
বিস্ময়ে চোখ বড় করে তাকাল জ্যোতি।

স্বস্তি আর আনন্দে হেসে উঠল। ওরে দুষ্ট! আমাকে ভয়
দেখানো হচ্ছে?

ওর মনের কথা ঠিকই বুঝে ফেলল মৎস্যকন্যা, শিসের মত
আওয়াজ করে মনের খুশি প্রকাশ করল। লেজ দিয়ে বাড়ি মারল
পানিতে।

তখনই ঘটল বিপদটা।

গাঢ় একটা ছায়ামত কি যেন হঠাৎ দেখা দিল ওদের মাথার
ওপর। জিনিসটা কি বোঝার জন্যে মুখ তুলল জ্যোতি।

জমে গেল।

বড় একটা জাল ঝপাৎ করে পড়ল ওদের ওপর। মুহূর্তের জন্যে
হাবা বনে গেল ও, তারপর হাত-পা ছুঁড়তে লাগল মরিয়া হয়ে।
কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো। আরও বেশি করে জালে জড়িয়ে
গেল ওরা।

টান পড়ল জালে। অসহায়ের মত হাঁসফাঁস শুরু করল জ্যোতি
আর মৎস্যকন্যা।

আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে মৎস্যকন্যা। সুন্দর চোখদুটো
বিস্ফারিত। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা আওয়াজ করল ওটা গায়ের জোরে।

জ্যোতির মনে হলো 'ইইইইইই!' করে কোন সঙ্কেত জানাচ্ছে
ওটা কাউকে। বিপদের খবর জানাচ্ছে।

জোর টান পড়ল জালে। উঠে যাচ্ছে ওরা পানি ছেড়ে।

আতঙ্কিত স্বরে এখনও চোঁচাচ্ছে মৎস্যকন্যা।

ষোলো

‘জ্যোতি!’ ডক্টর নেয়ামুল ইসলামের বিস্মিত গলা শোনা গেল।
‘তুমি? কি আশ্চর্য ব্যাপার!’

জালের ফাঁক দিয়ে ওপরে তাকাল ও। নিজের গবেষণাগারের
ডিঙিতে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। সাথে উপম আর মোকারম
হোসেন।

বোকার মত পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে উপম। দু’চোখ ঘন
ঘন জ্যোতি আর মৎস্যকন্যার ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। ওদিকে
বিজ্ঞানীর চোখ বিস্ফারিত। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। কিছু বলার চেষ্টা
করছেন। ঠোঁট নড়ছে, কিন্তু কথা বের হচ্ছে না মুখ দিয়ে।
মোকারম হোসেনের চেহারা হয়েছে দেখার মত।

‘ওটা সেই—!’ অনেক কষ্টে বললেন চাচা। ‘তুমি—শেষ পর্যন্ত
তুমি খুঁজে পেলেন ওটাকে?’

‘আগে আমাকে ওপরে তুলুন!’ চেষ্টা করে বলল ও। হাত-পা
পেঁচিয়ে বিশী অবস্থা ওর, ছাড়া পলে বাঁচে।

খোঁজা করলেন না ডক্টর ইসলাম। অবাক চোখে মৎস্যকন্যাকে

দেখছেন। বিড়বিড় করে বললেন, ‘লোকটা তাহলে ঠিকই বলেছিল! অবিশ্বাস্য কাণ্ড! অদ্ভুত!’

‘চাচা, ওদের তুলুন!’ চৈঁচিয়ে বলল উপম।

সচকিত হয়ে জাল ধরে টানলেন তিনি, উপম আর মোক্‌রম হোসেন হাত লাগাল। অনেক কষ্টে ওদের ডিঙিতে তোলা হলো। জ্যোতির পাশে প্রচণ্ড মোড়ামুড়ি করছে জলচর প্রাণীটা। প্রচণ্ড রাগে তীক্ষ্ণ, আজীব আওয়াজ করছে গলা দিয়ে।

জাল ছেড়ে ওটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী, হাত দিলেন কাজে। চড়াং করে ডিঙির পাটাতনে বাড়ি মারল ওটা।

‘আমি সত্যি দেখছি তো?’ বিড়বিড় করে বলে উঠলেন। ‘এ-কি সত্যি, না আর কিছু?’

‘আমাকে বের করুন!’ রেগে উঠল জ্যোতি। ‘তাড়াতাড়ি! সুতো কেটে গায়ে বসে যাচ্ছে।’

খেয়াল করল না কেউ। উপম ঝুঁকে মৎস্যকন্যার লেজের আঁশ ছুঁয়ে দেখল। ‘চাচা, এ-দেখি সত্যি মাছ!’ রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল।

‘কি করে সত্যি হয়!’ আপনমনে বললেন ডক্টর ইসলাম। ‘এমন আজীব কাণ্ড—জীবনে শুনিনি পর্যন্ত!’

সহকারী সামলে নিল প্রথমে। জাল সরিয়ে সাবধানে বের করল জ্যোতিকে। মৎস্যকন্যা যাতে ছুটে না যায়, কড়া নজর রাখল সেদিকে। একটু পর ডিঙি ঘুরিয়ে বোটের দিকে চলল ওরা।

‘আরি সম্বোনাশ!’ বিড়বিড় করে বলে চলেছে সহকারী বারবার। ‘মৎস্যকন্যা তাহলে সত্যি আছে! কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!’

একটু পর বোটের সাথে ডিঙি বাঁধা হলো। বিজ্ঞানী আর তাঁর

সহকারী মৎস্যকন্যাকে সাবধানে বের করার চেষ্টায় লাগলেন, কিন্তু কাজ হলো না। লাফ-ঝাঁপ করে নিজেকে আরও জড়িয়ে ফেলল ওটা।

কাজের ফাঁকে আপনমনে বলে চলেছেন নেয়ামুল ইসলাম; ‘দারুণ এক কাজ করে ফেলেছ তুমি, জ্যোতি। এটা যে কতবড় এক ঘটনা, অনুমান করতে পারছ? সারা পৃথিবীতে নাম ছড়িয়ে পড়বে তোমার। তুমি—’

মৎস্যকন্যার দমাদম লেজ ঝাপটানোর শব্দে তাঁর গলা চাপা পড়ে গেল। ভীষণ রেগে গেছে ওটা, ছাড়া পাওয়ার জন্যে ভীষণভাবে ছটফট করছে। ঘন ঘন চিৎকার করছে, গলা ক্রমে তীব্রতর হয়ে উঠছে।

তাই দেখে ব্যস্ত হয়ে উঠল মোকারম হোসেন। বিজ্ঞানীকে বলল, ‘স্যার, তাড়াতাড়ি কিছু করা উচিত।’

জ্যোতি চোখের পানি মুছে ওটাকে দেখল এক পলক। ‘চাচা, ওটাকে ছেড়ে দিন,’ বলল ও। ‘কষ্ট পাচ্ছে বেচারী।’

‘কোন চিন্তা নেই। ল্যাবের বড় ট্যাক্সে রাখব আমি এটাকে। মোকারম, তাড়াতাড়ি ট্যাক্সটা ভরে ফেলো।’

‘যাচ্ছি,’ বলে এক লাফে বোটে উঠে পড়ল সে।

বিজ্ঞানী জ্যোতির দিকে তাকালেন। ‘এখনই কি করে ছাড়ি বলো? আগে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখি একটু।’ একটা হাত রাখলেন ওর কাঁধে। ‘তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। ওটার কোন ক্ষতি হবে না।’

উপম ভখনও অবাক চোখে একবার জ্যোতিকে, একবার ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

মৎস্যকন্যাবে দেখছে। ‘তুই—তুই এটাকে পেলি কি করে বল তো!’

‘আমি পাইনি। বরং ওটাই পেয়েছে আমাকে।’

ওর পায়ের দিকে চোখ যেতে নজর কৌচকালেন বিজ্ঞানী।
‘এত রক্ত! কিভাবে পা কাটল?’

‘ও কিছু নয়। সামান্য কেটে গেছে। চাচা, ওটাকে ছেড়ে দিন।
খুব কষ্ট হচ্ছে ওর।’

পাতা দিলেন না তিনি। ‘আবার কোরাল রীফের কাছে
গিয়েছিলে বুঝি? ঘষা লেগেছে?’

মাথা ঝাঁকাল ও। ‘না, একটা হাঙর কামড়ে ধরেছিল।’

‘অ্যা?’ চোখ কপালে উঠল ডক্টর ইসলামের। ‘তারপর?’

‘এ আমাকে বাঁচিয়েছে ওটার হাত থেকে।’

‘বলো কি!’ নজর ঘুরে গেল তাঁর। নতুন দৃষ্টিতে মৎস্যকন্যাকে
দেখতে লাগলেন। ‘এ বাঁচিয়েছে? হাঙরের হাত থেকে?’

‘আজব কথা তো!’ অবিশ্বাসের সুরে বলল উপম। ‘এটা লড়াই
করেছে হাঙরের সাথে?’

জবাব দিতে যাচ্ছিল ও, এমন সময় আবার তীক্ষ্ণ স্বরে চৈচিয়ে
উঠল মৎস্যকন্যা। লেজ ধরে জোরে কয়েকটা বাড়ি মারল। দুলে
উঠল ছোট ডিঙি।

ওটার কানে তালা লাগানো সুতীক্ষ্ণ ‘ইইইইইই! ইইইইইই!’
চিংকারে চমকে উঠলেন বিজ্ঞানী। এবার আওয়াজটা শোনা
অনেকটা মানুষের গলার চিংকারের মত।

‘ওটাকে ছেড়ে দিন, চাচা!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যোতি।

‘জলদি ছেড়ে দিন।’

মাথা দোলালেন উপমের চাচা। ‘তা হয় না। আমি বিজ্ঞানী, জ্যোতি। অনেক বছর কেটেছে আমার সাগরতলের রহস্য জানার পেছনে। এই জিনিস যে বাস্তবে আছে, কোনদিন কল্পনাও করিনি। যে করেই হোক সম্পূর্ণ নতুন এক জিনিস ধরেছি। এখন যদি এটাকে ছেড়ে দেই, বিজ্ঞানের সাথে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। মতস্যকন্যা সম্পর্কে মানুষের জানার অধিকার আছে।’

রেগে উঠলেও গলা নিয়ন্ত্রণে রাখল জ্যোতি। ‘আপনি—’ থেমে একটু ইতস্তত করল। ‘আপনি আসলে টাকার লোভে পড়েছেন।’

জানে মন্তব্যটা করা উচিত হয়নি, কিন্তু না করে পারল না ও। বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে। আসলে ছটফট করতে থাকা প্রাণীটার কষ্ট সহ্য করতে পারছে না ও।

চেহারা পাল্টে গেল উপমের। চোখ কুঁচকে বন্ধুকে দেখল। ‘এসব কি বলছিস তুই, জ্যোতি?’

‘তুমি থামো!’ ডক্টর ইললাম বাধা দিলেন ভাইপোকে। ‘জ্যোতি, কথাটা তুমি ঠিক বলোনি। এর পেছনে টাকাই একমাত্র কারণ নয়।’

লজ্জা পেয়ে নজর নামিয়ে নিল ও। বোকার মত মন্তব্যটা করে বসায় নিজের ওপর রেগে উঠেছে।

‘টাকা আমার দরকার ঠিকই,’ আবার বললেন বিজ্ঞানী। ‘কিন্তু ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্যে নয়। দরকার গবেষণার জন্যে।’

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ও। ‘দুঃখিত, চাচা,’ কোনরকমে বলল। ‘ভুল হয়ে গেছে। কথাটা বলা ঠিক হয়নি আমার।’

খুশি হয়ে ওর পিঠি চাপড়ে দিলেন তিনি। 'গুড বয়! ভুল মানুষই করে। আমি কিছু মনে করিনি।' পরক্ষণে হেসে উঠলেন। 'ভেবে দেখো, জ্যোতি, এমন একটা জিনিস তুমিই প্রথম আবিষ্কার করেছ। কি সাংস্কারিক এক কাণ্ড করে বসেছ তুমি অনুমান করতে পারো?'

জবাব দিল না জ্যোতি। ব্যথিত চোখে মৎস্যকন্যাকে দেখল, ওটার কষ্ট অনুভব করার চেষ্টা করল।

'ঘাবড়িয়ে না। ওটার কোন ক্ষতি আমি করব না।'

মোকোরম হোসেন ফিরে এল। 'ট্যাক্স রেডি, স্যার।'

'আসছি,' বোটের আরেক মাথায় চলে গেলেন বিজ্ঞানী।

জ্যোতি আড়চোখে উপমের দিকে তাকাল। বোঝার চেষ্টা করল ওর মনের কথা। চাচার মত সে-ও কি ধরে রাখতে চায় মৎস্যকন্যাকে? না জ্যোতির মত—নাহ! হতাশ হয়ে ভাবল ও। চেহারা দেখে উপমের মনের অবস্থা বোঝার উপায় নেই। আসলে ও বুঝতেই পারছে না কোনটা সঠিক, কোনটা নয়।

তবে জ্যোতি জানে মৎস্যকন্যাকে ছেড়ে দিতে বলে ঠিকই করেছে ও। ভুল করেনি। ওকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না।

লাফঝাঁপ থেমে গেছে ওটার। এখন আর চিৎকারও করছে না। স্থির হয়ে পড়ে আছে। দম নিচ্ছে ঘন ঘন। বিষণ্ণ চোখে একভাবে সাগরের দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে পানি।

বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল জ্যোতির। একটু আগে পানির নিচে ওর সাথে খুনসুটি করতে থাকা মৎস্যকন্যাকে এর সাথে মেলাতে পারছে না কোনমতেই। কোন কুক্ষণে যে ওটাকে খুঁজতে সাগরে নেমেছিল ও!

এভাবে চোখের সামনে এত কষ্ট পাচ্ছে বোচারী, সহ্য হচ্ছে না।
কি করা যায়? ভাবছে জ্যোতি। কি করে মুক্তি দেয়া যায় ওকে?

একটু পর মোকারম হোসেনকে নিয়ে ফিরে এলেন বিজ্ঞানী।
দু'জনে ধরে ধরে মৎস্যকন্যাকে বোটে তুলল। 'ভয় পেয়ো না,'
ওটার মাথায় আদরের পরশ বুলিয়ে বললেন চাচা। 'আমরা তোমার
ক্ষতি করব না।'

মনে হলো তাঁর বক্তব্য বুঝতে পেরেছে ওটা। নড়ল না। তবে
ভীত সবুজ দু'চোখ কোটরের মধ্যে ঘুরছে ঘন ঘন। ফোঁপাচ্ছে
মৎস্যকন্যা। বিলাপ করছে করুণ স্বরে।

ধরাধরি করে ল্যাবের প্রকাণ্ড কাঁচের ট্যাক্সের কাছে নিয়ে আসা
হলো ওটাকে। সাগরের পানি দিয়ে ট্যাক্স ভরে ফেলেছে মোকারম
হোসেন, নীল পানি টলটল করছে ভেতরে।

মৎস্যকন্যাকে সাবধানে ভেতরে ছেড়ে দেয়া হলো। ট্যাক্সের
ঢাকনা টেনে দিল সহকারী। হুক লাগিয়ে দিল।

একবার—দু'বার পানিতে সবুজ লেজ নাড়ল ওটা, তারপর
থেমে গেল। যেন হঠাৎ বুঝতে পেরেছে ওটা তার বাড়ি নয়, সাগর
নয়। সুন্দর একটা খাঁচা ওটা।

ট্যাক্সের নিচে আস্তে করে শুয়ে পড়ল মৎস্যকন্যা। অনড়। মনে
হলো প্রাণ নেই, মরে গেছে।

একদম স্থির হয়ে গেছে। পলক পড়ছে না চোখে। দম নিচ্ছে
না।

আতঙ্কে জমে গেল জ্যোতি। রাগে, হতাশায় চিৎকার করে
উঠল, 'ও—ও মরে গেছে! মৎস্যকন্যা মরে গেছে! ওটাকে মেরে

ভয়ানক দুঃস্থপ

ফেলেছেন আপনারা!’

বিজ্ঞানী চমকে উঠলেন। ‘কি!’

‘মৎস্যকন্যা মরে গেছে। ওকে—ওকে—’

সতেরো

উপম এক দৌড়ে ট্যাক্সের ওপাশে গিয়ে উঁকি দিল। ‘জ্যোতি, দেখ—’ চোঁচিয়ে উঠল উত্তেজিত গলায়।

দ্রুত ওর পাশে চলে এল ও। ‘কি?’

‘ও মরেনি!’ তর্জনী তুলে বলল উপম। আঙুল কাঁপছে। ‘মৎস্যকন্যা মরেনি। ওই দেখ! ও মনে হয় কাঁদছে, আর আর কিছু। কিন্তু মরেনি।’

চোখ ডলতে ডলতে ভেতরে এসে দাঁড়াল রাজা। এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে ওর সবার হাঁকডাকে। ফ্যালফ্যাল করে ওদের দিকে তাকাচ্ছে। হঠাৎ ট্যাক্সের ওপর চোখ পড়তে হাঁ হয়ে গেল। ‘আরে! ওটা কি?’

উজ্জ্বল দিল না কেউ। শোনেইনি ওর প্রশ্ন। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতি। উপমের কথাই ঠিক, ভাবছে ও।

দু'হাতে মুখ ঢেকে উপুড় হয়ে পড়ে আছে ওটা। 'কি করা যায়?'
আপনমনে বলল ও।

এ-প্রশ্নেরও জবাব দিল না কেউ।

বেশ কিছুক্ষণ পর বিজ্ঞানী বললেন, 'ওকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা
করতে হবে।' চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে।

জ্যোতির পাশে দাঁড়িয়ে আছে রাজা। চোখে ঘুমের রেশমাত্র
নেই। 'ওটা কি, জ্যোতি? অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক মাছ—মৎস্যকন্যা
নাকি?'

খেয়াল করল না ও। মন বিজ্ঞানীর দিকে। 'কি খাওয়াবেন? ওটা
কি খায়, তাই বা বুঝব কি করে?'

'ওকে জিজ্ঞেস করে দেখা যেতে পারে?' সহকারী বলল। 'কথা
বলতে পারে বোধহয় ওটা, তাই না, জ্যোতি?'

মাথা দোলাল ও। 'মনে হয় না। কথা বলতে শুনিনি, শুধু
আওয়াজ করে নানা রকম। বোঝা যায় না।'

উপম আর রাজা ফিস্‌ফিস্‌ করে কি যেন আলাপ করছে। রাজার
চোখ সেই যে কপালে উঠেছে, আর নামছেই না।

'বাজার থেকে কিছু কিনে এনে চেষ্টা করে দেখা যাক খায় কি.
না,' মোকারম হোসেন বলল।

'চিকেন সুপ দিয়ে দেখা যেতে পারে,' উপম প্রস্তাব দিল।

'অথবা নুডলস্?' প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল রাজা।

মাথা দোলালেন চিন্তিত ডক্টর ইসলাম। 'নাহ্, ওসব কাজ হবে
না। জিনিসটা থাকে সাগরে, খায়ও নিশ্চয় সাগরের কিছু। হয়তো
ছোট মাছ-টাছ, অথবা উদ্ভিদ।' দরজার দিকে এগোলেন তিনি।

‘আমিও যাই দেখি।’

ডিঙি নিয়ে দ্বীপের দিকে রওনা হলেন বিজ্ঞানী। গবেষণাগারে তিন বন্ধু চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। কথা নেই কারও মুখে। তিনজোড়া চোখ সঁটে আছে ট্যাক্সের ওপর।

বেশ গরম পড়েছে। মেঘ করেছে নাকি? ভাবল জ্যোতি। বৃষ্টি নামবে? ঝড় উঠবে?

‘চল, বাইরে যাই,’ রাজা বলে উঠল। ‘খুব গরম লাগছে।’

ওরা চলে গেল। জ্যোতি নড়ল না। মৎস্যকন্যাকে একা রেখে যেতে মন চায় না। একটু পর মুখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে তাকাল ওটা, ওকে একা দেখে কিনারার দিকে চলে এল। কাঁচে দু’হাত রেখে দাঁড়িয়ে গোলাপী ঠোঁট গোল করে আদুরে শব্দ করতে লাগল গলা দিয়ে। কি যেন বলছে, কিন্তু বুঝল না ও।

অভয় দেয়ার ভঙ্গিতে হাত নাড়ল।

তাকিয়ে থাকল মৎস্যকন্যা।

‘কিছু খাবে? খিদে পেয়েছে?’ পেটে হাত বোলাল ও, তারপর হাঁ করে মুখে গাস তোলার ভঙ্গি করল।

বুঝল না ওটা, তাকিয়ে আছে।

আবার একই ভঙ্গি করে দেখাল ও। মাথা ওপর-নিচে অথবা ডানে-বাঁয়ে করে কিভাবে হাঁ বা না বোঝাতে হয়, দেখাল। ‘খিদে পেলে “হ্যাঁ” বলো, না পেলে “না”।’

কিছুক্ষণ নড়ল না মৎস্যকন্যা, তারপর মাথা দোলাল ওপর-নিচে।

‘“হ্যাঁ”?’ বলল জ্যোতি। ‘তার মানে খিদে পেয়েছে?’

এবার ‘না’ বোঝাল ওটা।

কোথ কোঁচকাল ও। ‘“না”? খিদে পায়নি?’

আবার ‘হ্যাঁ’ বোঝাল মৎস্যকন্যা। পরক্ষণেই ‘না’।

মনে মনে হাসল জ্যোতি। বুঝল ওকে নকল করছে ওটা।

আসল ব্যাপার না বুঝেই অর্থহীন মাথা দোলাচ্ছে।

ওটাকে কিছু সময় মন দিয়ে দেখল জ্যোতি। নিচের অংশ যাই হোক, ওপরের অংশ ওরই মত মৎস্যকন্যার। ওটারও জ্যোতির মত পেট আছে, তার মনে খিদে নিশ্চয় লেগেছে। সেটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কি খায় মৎস্যকন্যা? ও যা খায়, সেসব?

আবার আদুরে শব্দ করল ওটা। একটু পর আবার কাঁদতে শুরু করল। জ্যোতি মনে মনে রেগে উঠল। এভাবে ওকে কষ্ট দেয়ার কোন অধিকার নেই বিজ্ঞানীর। ও আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে, বিনিময়ে জ্যোতিরও ওটাকে সাহায্য করা উচিত।

কিন্তু কিভাবে? নিজেকে অপরাধী, অসহায় মনে হলো জ্যোতির।

বুদ্ধিটা হঠাৎ করে মাথায় এল।

হয়তো উপমের চাচা অসন্তুষ্ট হবেন, রেগে উঠবেন। কিন্তু তাতে ওর কিছু আসবে যাবে না। পরোয়া করে না জ্যোতি।

ও অন্যায় কিছু করছে না।

আঠারো

হাত কাঁপতে লাগল জ্যোতির। ট্যাক্সের পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। কাঁপা হাতে ঢাকনার হুক ধরল। গরম নিঃশ্বাস পড়ছে। জ্যোতির চাইতে বেশ কিছুটা উঁচু ট্যাক্সটা, ভেতর থেকে মৎস্যকন্যাকে কিভাবে বের করবে ভেবে পাচ্ছে না ও।

কিন্তু তাই বলে থামল না। হুকটা বেশ শক্ত হয়ে এঁটে বসে আছে, খুলতে কষ্ট হলো। ওর মনের কথা বুঝল বোধহয় মৎস্যকন্যা, ভেতরে ছোট্টাছুটি করে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল।

মূনের খুশিতে ডাক ছাড়ল, 'ইইইইইইই!'

'চুপ, চুপ!' মুখের সামনে তর্জনী তুলে সতর্ক করল জ্যোতি।
'শব্দ করো না, শুনে ফেলবে কেউ।'

ঢাকনা তুলতে যাচ্ছিল, এমন সময় কাঁধে একটা হাত পড়তে চমকে উঠল ও। ঢোক গিলে ঘুরে তাকাল। মোকারম হোসেন!

'কি করছ তুমি?' গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল সে।

উত্তর দিতে পারল না ও। ধরা পড়ে চেহারা কালো হয়ে গেছে। কিছু বলার চেষ্টা করল, কিন্তু গলায় স্বর ফুটল না।

‘কি করছিলে তুমি, জ্যোতি?’ একইরকম সুরে বলল সহকারী।
ট্যাক্সের কাছ থেকে সরে দাঁড়ান ও। সত্যি কথাটা একে বলা
ঠিক হবে কিনা ভাবছে। মিথ্যে বলতে পারে না জ্যোতি। জিভে
জড়িয়ে যায়।

‘বললে না?’

‘আমি—আমি ওকে ছেড়ে দিতে যাচ্ছিলাম!’ উত্তেজিত গলায়
বলল ও। ‘ওকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না। ওর কষ্ট হচ্ছে।’

ট্যাক্সের দিকে তাকান লোকটা। জ্যোতিও তাকান। হতাশ
হয়ে ওটার মেঝেতে শুয়ে পড়েছে আবার মৎস্যকন্যা। কাঁদতে শুরু
করেছে। বুঝে ফেলেছে ছাড়া পাওয়ার সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে।

‘দেখুন, কাঁদছে ওটা,’ জ্যোতি বলল।

সমবেদনা ফুটল সহকারীর চেহারায়ে। বোঝা যায় সে-ও অনুভব
করতে পারছে ওটার কষ্ট। তবে নিজের কর্তব্যের কথা ভুলল না।

মৃদু চাপড় মারল ওর কাঁধে। ‘আমি বুঝি, জ্যোতি। কিন্তু কিছু
করার নেই। স্যারের কাছে ওটা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তোমাকে তা
বুঝতে হবে। সারাজীবন সাধনা করেও এতবড় এক সুযোগ আজও
পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী পাননি। আমাদের স্যার পেয়েছেন। এই সুযোগ
তাকে জগৎসেরা বিজ্ঞানীর সম্মান পাইয়ে দেবে তা জানো? এখন
যদি তুমি ওটাকে ছেড়ে দাও, মন ভেঙে যাবে তাঁর।’

হাত ধরে ওকে বাইরের দিকে টানল মোকারম হোসেন।
‘এসো, শুধু শুধু মন খারাপ করো না।’

‘ওনার মন ভেঙে যাবে!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যোতি। ‘কিন্তু
ওটার যে মন ভেঙে গেছে, তার কি?’ মৎস্যকন্যাকে দেখাল

ইঙ্গিতে। ‘ও খোলা সাগরের প্রাণী, ওইটুকু ট্যাঙ্কের মধ্যে ওর দম আটকে আসছে। ছেড়ে দিলে—’ লোকটাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল ও।

‘সেটা ঠিক হবে না, জ্যোতি। তাছাড়া শুধু শুধু দুর্ভিক্ষ করছ তুমি। অল্পদিনের মধ্যে মৎস্যকন্যার জন্যে ভাল একটা থাকার জায়গার ব্যবস্থা করা হবে। ওখানে সাঁতার কাটতে, খেলতে, কোন অসুবিধে হবে না ওটার, দেখো।’

‘হ্যাঁ, জানি, তেতো হয়ে উঠল ওর মন। সার্কাস মালিকদের তৈরি বড় খাঁচায় জায়গা হবে। তার টাকা রোজগারের চিড়িয়া হবে মৎস্যকন্যা, মনে মনে বলল।

চিন্তিত ভঙ্গিতে গাল চুলকাল মোকারম হোসেন। ‘আমার স্যার খুব নরম মনের মানুষ। খুব সতর্ক। ওটার জন্যে যা ভাল হবে, তাই করবেন উনি, দেখো। তাছাড়া মৎস্যকন্যার ওপর গবেষণারও দরকার আছে। গবেষণা না করলে মানুষ জানবে কি করে ওটার ব্যাপারে?’

হাল ছেড়ে দিল জ্যোতি। ‘হ্যাঁ, তা ঠিক।’

‘এই তো, গুড বয়,’ হাসল লোকটা। ‘চলো যাই। খিদে পেয়েছে খুব।’

ওর হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল সে। বেরিয়ে যাওয়ার আগে শেষবারের মত ট্যাঙ্কের দিকে তাকাল জ্যোতি।

এখনও একভাবে শুয়ে আছে মৎস্যকন্যা। দু’হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। লতা-গুন্মের মত পানিতে ভাসছে ওর সোনালি চুল, দোল খাচ্ছে অল্প অল্প।

‘আমাদের খাওয়ার চাইতে ওটার খাওয়া জরুরী,’ জ্যোতি বলল। ‘ওর নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে।’

‘ভাল কথা বলেছ। কিন্তু কি খাওয়ানো যায়? স্যার তো এখনও এলেন না,’ চোখ কুঁচকে দূরের সেন্ট মার্টিনের দিকে তাকাল সে। ‘এক কাজ করা যাক। রাজাকে যে মাছ খাওয়াই আমরা, ওগুলোর নাম স্কুইড। সামুদ্রিক। চেষ্টা করে দেখা যাক ওগুলো খায় কিনা মৎস্যকন্যা। কি বলো?’

খুশি হয়ে উঠল জ্যোতি। ‘হ্যাঁ, তাই দিন। আমি দেখি চেষ্টা করে।’

একটু পর বড় বাটিতে বেশ কিছু স্কুইড তুলল মোকারম হোসেন। ওটা নিয়ে দু’জনে মৎস্যকন্যার ট্যাঙ্কের কাছে এসে দাঁড়াল। স্কুইড শামুক জাতীয় ছোট মাছ। জেলেরা টোপ হিসেবে ব্যবহার করে।

বাটি ট্যাঙ্কের কাছে ধরে হাসল জ্যোতি ওটার দিকে তাকিয়ে। ‘এগুলো পছন্দ করো? বাবে?’

কাছে এসে ভেতরের জিনিসগুলো দেখে খুশি হয়ে উঠল মৎস্যকন্যা। গাঢ় সবুজ লেজ দিয়ে বাড়ি মারল পানিতে। হ্যাঁ করল।

যাক, খুশি হয়ে ভাবল জ্যোতি, ওর পছন্দের খাবার একটা অন্তত পাওয়া গেল। এখন আর না খেয়ে কষ্ট পাবে না বোচারী।

মোকারম হোসেন ট্যাঙ্কের ঢাকনা তুলে ধরতে রাবারের মত নরম একটা স্কুইড ভেতরে ছেড়ে দিল ও। লাফ দিয়ে ওটা মুখে পুরে নিল মৎস্যকন্যা, মজা করে চিবাতে শুরু করল। চেহারা খুশি খুশি।

জ্যোতির মুখেও হাসি ফুটল।

আরও কয়েকটা স্কুইড ভেতরে ফেলল, টপাটপ মুখে পুরে
খেয়ে নিল ওটা।

নিজের পেটে হাত বোলাল জ্যোতি। ‘কেমন মজা?’ বলে ‘হ্যাঁ’
সূচক মাথা দোলাল।

ওকে নকল করল মৎস্যকন্যা।

শব্দ করে হেসে উঠল জ্যোতি। ওর কথা বুঝতে পেরেছে ওটা!
ভাবল বিশ্বয়ের সাথে। মৎস্যকন্যা ওর ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছে!

মোকারম হোসেনও খুশি হয়েছে বেশ। চেহারায় স্বস্তির ভাব
ফুটেছে। ‘বাঁচা গেল!’ অস্ফুটে বলল সে।

‘আমার অ্যাকাউন্টে আরও একটা বিশ্বরেকর্ড যোগ হলো
তাহলে,’ আরও কিছু স্কুইড ভেতরে ফেলে বলল জ্যোতি।

‘মানে?’

‘মৎস্যকন্যার সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে প্রথম রেকর্ড। পরেরটা হচ্ছে
তার সাথে ভাবের আদান-প্রদান করতে সফল হওয়া।’

চওড়া হাসি ফুটল সহকারীর মুখে। ‘ঠিক বলেছ। দাঁড়াও,
নোটবুকে টুকে রাখি। নইলে হয়তো ইতিহাসে লেখা হবে না
রেকর্ড দুটোর কথা।’

‘ওটা যদি আরও ক’দিন থাকে, হয়তো ওর ভাষাও বুঝে ফেলব
আমি,’ জ্যোতি বলল। ‘ওকেও বোঝাব আমাদের ভাষা।’

‘গুড! সেই চেষ্টাই করো,’ সত্যি সত্যি নোট বুকে কি সব
লিখল সহকারী, তারপর ওটা বন্ধ করে পকেটে রাখল। ‘ওর তো
পেট পূজো হলো, এবার আমাদের ব্যবস্থা করি, চলো।’

বেরিয়ে এল ওরা ল্যাব ছেড়ে।

পেট ঠাণ্ডা হতে অনেক শান্ত হয়ে গেল মৎস্যকন্যা। কিছু সময়ের জন্যে ভুলে গেল বন্দিত্বের কথা।

নীরবে খেয়ে নিল জ্যোতি। উপম আর রাজাকে আমল দিল না তেমন। আপন চিন্তায় ডুবে আছে। মৎস্যকন্যার ব্যাপারে অসংখ্য প্রশ্ন করল ওরা, একটারও জবাব না পেয়ে শেষ পর্যন্ত মুখ বুজে হাতের কাজে মন দিল।

একঘণ্টা পর দ্বীপ থেকে ফিরলেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম। একগাদা সামুদ্রিক মাছ কিনে এনেছেন। ছোট ছোট মাছ। দেখা গেল তার মধ্যেও কিছু কিছু পছন্দ মৎস্যকন্যার। বেশ মজা করে খেল।

ট্যাক্সের মধ্যে অভুত এক যন্ত্র ঢুকিয়ে দিলেন তিনি। বললেন, 'এটার নাম সোনার মনিটর। মৎস্যকন্যার ভাষা কেমন, এটা দিয়ে বোঝা যাবে কিছুটা।'

কয়েকটা সরু ও মোটা কাঁচের পাইপও ভরে দিলেন তিনি ট্যাক্সের মধ্যে। ওগুলোর কি কাজ, বুঝতে পারল না জ্যোতি।

নাকেমুখে দুপুরের খাওয়া সেরে নোটবুক নিয়ে ট্যাক্সের কাছে বসলেন ডক্টর ইসলাম। সহকারীর সাথে কি সব বৈজ্ঞানিক ব্যাপার-স্বাপার আলোচনা করলেন কিছুক্ষণ, কিছুই বুঝল না ওরা। এটা-ওটা তথ্য টুকে নিলেন।

কিছু সময় পর সোনার মনিটরের ওপর চোখ বোলালেন। চিন্তা ফুটল চেহারায়। 'দারুণ তো!' জ্যোতির দিকে ফিরে হাসলেন তিনি। 'মৎস্যকন্যা সোনার সঙ্কেত পাঠাচ্ছে আমাদের মনিটরের সাহায্যে। তিমি যেমন করে সঙ্কেত পাঠায় দূরের সঙ্গীদের কাছে, ঠিক তেমনি করে।'

‘তাই নাকি, বিস্মিত হলো ও।

ওপর-নিচে মাথা দোলালেন বিজ্ঞানী। চোখ কুঁচকে মৎস্যকন্যার দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হলো চিন্তায় পড়ে গেছেন।

‘ওটাও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে?’ আবার বলল জ্যোতি।

‘হ্যাঁ।’

‘কার কাছে?’

সোজা হলেন বিজ্ঞানী। আরেকবার মনিটরের রীডিং পরীক্ষা করলেন। ‘ওর সঙ্গীদের কাছে নিশ্চয়!’

হ্যাঁ হয়ে গেল জ্যোতি। ‘তার মানে?’

‘তার মানে,’ ইঙ্গিতে সাগর বোঝাতে চাইলেন ডক্টর ইসলাম। ‘ওখানে নিশ্চয় আরও মৎস্যকন্যা আছে। সঙ্কেত দিয়ে ওদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইছে এটা। হয়তো নিজের বিপদের কথা জানাচ্ছে।’

বোকা হয়ে গেল ও। আরও মৎস্যকন্যা আছে!

কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য!!

এক সময় রাত হলো। রাত গভীর হলো। মৎস্যকন্যাকে স্কুইড খাইয়ে নিজের বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল জ্যোতি। ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়তে চাইছে, অথচ ঘুম আসছে না কিছুতেই।

মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে মৎস্যকন্যার অসহায় বন্দিদশার কথা। ওটার করুণ চাউনির কথা। একা একা ল্যাবে নিশ্চয় ভয় পাচ্ছে ওটা, ভাবল জ্যোতি। কিন্তু কিভাবে ওকে সাহায্য করা যায় মাথায় এল না।

আবোল-তাবোল ভাবতে ভাবতে কখন যেন দু’চোখ লেগে

এসেছিল, টেরই পেল না ও। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসল কারও ছুটে আসার শব্দ শুনে। ‘জ্যোতি! জ্যোতি!!’ হড়মুড় করে ভেতরে ঢুকল উপম। হাঁপাচ্ছে। চোখ কপালে উঠে গেছে।

ঘাবড়ে গেল ও। ‘কি! কি হয়েছে?’

‘ঘটনা পঁ্যাচ খেয়ে গেছে। মৎস্যকন্যা—’ থেমে গেল সে কথা শেষ না করে।

‘মৎস্যকন্যা কি?’ ছাঁৎ করে উঠল জ্যোতির বুকের মধ্যে। নিশ্চয় খারাপ কিছু ঘটেছে ওটার। মরে গেছে?

‘মৎস্যকন্যা—মৎস্যকন্যা নেই!’ চেষ্টা করে উঠল উপম। ‘পালিয়ে গেছে! ট্যাঙ্ক খালি!’

উনিশ

সশব্দে আঁতকে উঠল জ্যোতি। ‘কি বললি?’

‘হ্যাঁ, জলদি আয়!’ চেষ্টা করে বলল উপম। ‘ট্যাঙ্কে নেই মৎস্যকন্যা। কোথায় গেল কে জানে!’

ধাঁক্কা মেরে ওকে পথ থেকে সরিয়ে দিয়ে তীরবেগে ছুটল প্রধান। কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে উঠে এল ওপরের ডেকে।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

আজব ব্যাপার—মনটা খুশি খুশি লাগছে ওর। মৎস্যকন্যা পালাতে পেরেছে, নিজের স্বাধীন জগতে চলে যেতে পেরেছে ভেবে আনন্দ হচ্ছে। সামান্য কষ্টও অবশ্য হচ্ছে ওটার সাথে হয়তো জীবনে আর দেখা হবে না ভেবে।

মেরিন বায়োলজিস্ট ডক্টর নেয়ামুল ইসলামের স্বপ্ন সফল হলো না ভেবে খারাপ লাগল। বেচারার মনে কষ্ট পাবেন নিশ্চয়।

তবু মৎস্যকন্যা ভাল থাকুক, মনে মনে বলল জ্যোতি। নিজের ভুবনে ফিরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে আনন্দে থাকুক।

ওপরে গেছে থামল ও। অন্ধকারে চোখ সইয়ে নেয়ার জন্যে দাঁড়াল একটু। আকাশে জ্বলজ্বল করছে লক্ষ নক্ষত্র।

ল্যাবের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজাটা খোলা। ভেতরের অল্প আলোয় বড় ট্যাক্সের ভেতরটা ঠিকমত দেখা যায় না। কাছে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছিল জ্যোতি, উপম ওকে ঠেলে আগে ঢুকে পড়ল। দৌড়ে গেল ট্যাক্সের দিকে।

জ্যোতিও এগোল, ওটার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিয়েই বোকা হয়ে গেল। ভেতরেই আছে মৎস্যকন্যা। নির্জীবের মত ভাসছে। মৃদু আলোতেও চক্‌চক্‌ করছে ওটার সবুজ লেজ।

ব্যাপার বুঝে উঠতে কিছুটা সময় লাগল ওর। হুঁশ হলো উপমের চাপা হাসির শব্দে। ‘কি ব্যাপার?’ চোখ কৌচকাল জ্যোতি।

‘কি মজা!’ হাততালি দিয়ে উঠল উপম। ‘কেমন বোকা বানালাম দেখলি? কি মজা, ইয়া হু!’ দু’হাত শূন্যে ছুঁড়ল।

রাগে পা থেকে মাথার তালু পর্যন্ত জ্বলে উঠলেও সামলে নিল ও। জানে উপম ওকে খেপিয়ে তুলতে চাইছে। তাহলে খুশি হয় ও।

কিন্তু জ্যোতির তাতে ঘোর আপত্তি। ওকে খুশি করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

শান্ত গলায় বলল, ‘অনেক মজা পেয়েছি, কেমন? নিজেকে খুব চতুর মনে হচ্ছে তোর? ঠিক আছে, তোকে চ্যাম্পিয়ন সার্টিফিকেট দিলাম আজ। খুশি তো?’

পরিকল্পনা মাঠে মারা গেল দেখে উল্টে উপমই বোকা বনে গেল। হাসি বন্ধ হয়ে গেছে, মাথা চুলকাচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা যে ওর কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত, চেহারাতেই ফুটে আছে তা।

ওদিকে জ্যোতিকে দেখতে পেয়ে নড়ে উঠল মৎস্যকন্যা। কাঁচের দেয়ালের কাছে এসে মৃদু, আদুরে গলায় ডাকতে লাগল। মুখে হাসি।

‘এটা দেখতে খুব সুন্দর, নারে?’ পটাতে চাইল উপম।

সুযোগটা এখন আরেকবার নিয়ে দেখব নাকি? ভাবল জ্যোতি। অন্যরা সব মনে হয় ঘুমিয়ে আছে, যদি এই ফাঁকে উপমকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওটাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে রাজি করানো যায় তাহলে—।

চেষ্টা করে দেখা যাক, সিদ্ধান্ত নিল ও। ওটার কষ্টের কথা ভালমত বোঝাতে পারলে উপম নিশ্চয় রাজি হবে। দু’জনে মিলে ওটাকে ট্যাঙ্ক থেকে বের করা অনেক সহজ হবে তাহলে।

‘উপম!’ চাপা গলায় ডাকল জ্যোতি।

ওর কণ্ঠে সন্ধির আভাস পেয়ে এগিয়ে এল ও। ‘কি?’

‘একটা কথা—’

‘কি কথা?’

‘মানে—’ আমতা আমতা করতে লাগল জ্যোতি। ‘বলছিলাম, মৎস্যকন্যার এখানে নিশ্চয়—’

দরজার কাছে আবছামত একটা কাঠামো দেখতে পেয়ে থেমে গেল। ‘ভেতরে কে কথা বলে?’ উপমের চাচা বলে উঠলেন। ‘জ্যোতি নাকি?’

‘আমি উপম, চাচা,’ তাড়াতাড়ি বলে উঠল ও। ‘আমি আর জ্যোতি।’

‘এখানে কি করছ তোমরা এতরাতে?’ বলতে বলতে ভেতরে এসে দাঁড়ালেন বিজ্ঞানী। ‘রাত কত হয়েছে খেয়াল আছে?’

‘শুয়ে পড়েছিলাম,’ জ্যোতি বলল। ‘কিন্তু গরমে ঘুম আসছে না দেখে উঠে এসেছি। ভাবলাম একটু হাঁটাহাঁটি করে—’

‘হ্যাঁ, চাচা,’ ওকে থামিয়ে বলে উঠল উপম। ‘সেই সাথে মৎস্যকন্যাকেও এক নজর দেখা হবে ভেবে এসেছি।’

‘ভাল করেছ। এবার শুতে যাও। ওকে নিয়ে চিন্তা নেই। আমি রাতে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। ওরও এখন বিশ্রাম দরকার। যাও।’

ট্যাক্সের দিকে হতাশ চোখে তাকাল জ্যোতি। বোধহয় ডক্টর ইসলামের সাড়া পেয়েই নীরব হয়ে গেছে মৎস্যকন্যা। শব্দ করছে না আর, ট্যাক্সের মেঝেতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েছে। ডান হাতের ভাঁজে মুখ গুঁজে রেখেছে।

‘কোন চিন্তা ক্লোরো না ওকে নিয়ে,’ আবারও বলে উঠলেন বিজ্ঞানী। ‘ঘুমাতে যাও। আমি জেগে আছি।’

‘আচ্ছা,’ বলল জ্যোতি ।

ওর গলার স্বরে অন্যরকম কিছু আছে টের পেয়ে হাসলেন তিনি । অনর্থক ভাবছ তুমি, জ্যোতি । আমি মৎস্যকন্যার কোন ক্ষতি হতে দেব না । কল সকালে তোমরা ওকে সম্পূর্ণ সুস্থ দেখতে পাবে । যাও, ঘুমাও গিয়ে ।

নীরবে বেরিয়ে এল ওরা ।

বাতাস ছেড়েছে সামান্য, সাগরে ঢেউ উঠছে । অল্প অল্প দুলছে সীগাল । ঘূর্মিয়ে পড়েছে সবাই । একটু আগে ওপরের ডেকে একজোড়া পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছিল, খুব সম্ভব উপমের চাচার । এখন তাও শোনা যাচ্ছে না ।

জ্যোতি এপাশ-ওপাশ করছে বিছানায় । ঘুম আসছে না কিছুতেই । চিং হয়ে শুলো ও । ওপর দিকে তাকিয়ে থাকল । চাঁদ উঠেছে । জানালা দিয়ে আলো আসছে কেবিনে, কেমন এক মায়াবী পরিবেশ ।

মাথার মধ্যে ওর একটাই চিন্তা—মৎস্যকন্যা ।

নিজেকে ওটার জায়গায় কল্পনা করছে জ্যোতি । । ওকে যদি কেউ ইচ্ছের বিরুদ্ধে এভাবে বন্দি করে রাখত, কেমন লাগত বুঝতে চেষ্টা করছে ।

অসহ্য লাগত ! চিন্তাই করা যায় না । ওর স্বাধীনতার ওপর আর কেউ হস্তক্ষেপ করবে, নিশ্চয় তা মেনে নিত না জ্যোতি ।

উঠে বসল ও । জানালা দিয়ে উঁকি দিল । নাক এগিয়ে খোলা বাতাস টেনে নিল বুক ভরে । এই ছোট্ট কেবিনে হঠাৎ নিজেকে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

বন্দি মনে হতে লাগল ওর। ছাড়া পাওয়ার জন্যে মন হুটফুট করছে।

উপমের চাচা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন? ভাবছে ও। মৎস্যকন্যা? আরেকবার উঠে গিয়ে দেখে আসবে নাকি? নাহ, থাক। উনি দেখে ফেললে নিশ্চয় খারাপ ভাববেন।

সার্কাস কোম্পানির মালিকের কথা খেয়াল হলো। যে কোনদিন এশে পড়বে ওরা, টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে মৎস্যকন্যাকে। তাদের ওখানে কি ঠিকমত যত্ন নেয়া হবে ওটার? মনে হয় না। ইলিয়াস মোল্লা বিজ্ঞানী নয়, কিসে ওটার ভাল হবে, কিসে মন্দ, ডক্টর ইসলামের মত বুঝবে না সে।

কতই বা আর যত্ন করবে মৎস্যকন্যার? বড়জোর এখনকার ট্যাক্সের চাইতে একটু বড় ট্যাক্স তৈরি করবে ওর থাকার জন্যে। আর কি করতে পারবে?

টিকিট কেটে সারাদিন ধরে মানুষ আসবে ওকে দেখতে। দুট্ট ছেলেমেয়েরা হয়তো ভয় দেখাবে কাঁচের ওপাশ থেকে, ভেঙেটি কাটবে, খোঁচাবে। কে জানে? হয়তো মনের কষ্টে একদিন বেচারী—

সোজা কথা চিরকালের মত বন্দি হয়ে থাকতে হবে মৎস্যকন্যাকে। মুক্তির কোন পথ থাকবে না।

আমিই দায়ী, ভাবল জ্যোতি। ওটার এই অবস্থার জন্যে আমিই সম্পূর্ণ দায়ী। ওর জন্যে কিছু করা উচিত। কিন্তু কি করবে ও? কি করার আছে?

এমন সময় একটা আওয়াজ কানে এল জ্যোতির—মৃদু গুঞ্জনের মত।

কি ওটা?

বাইরে তাকাল ও।

একটা ট্রলার! ওটার কোথাও কোন আলো নেই, পুরো অন্ধকার। ওদের দিকেই আসছে। কি ব্যাপার? কাদের ওটা?

ইলিয়াস মোল্লার নয়তো?

না, ওটার চেয়ে বেশ বড় লাগছে যেন!

চোখ কুঁচকে ভাল করে তাকাল জ্যোতি। হ্যাঁ, তাইতো! বড়ই তো! কিন্তু অন্ধকার কেন? সীগালের দিকেই আসছে কেন?

কাছে এসে পড়ল ট্রলারটা। এঞ্জিন বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। নিঃশব্দে বড়সড় এক প্রাণীর মত এগিয়ে আসছে। পাশ দিয়ে সীগালের গায়ে মৃদু ঘষা খেয়ে থেমে পড়ল ওটা।

দুটো কালো ছায়া ওটা থেকে দ্রুত সীগালে চলে এল।

কারা ওরা?

আরও দু'জন এসে চড়ল।

উত্তেজিত হয়ে উঠল জ্যোতি। মুখ-গলা শুকিয়ে গেল মুহূর্তে। বুকের মধ্যে পাগলা ঘোড়ার মত লাফাচ্ছে হৃৎপিণ্ড।

ওরা কারা? কি চায়? কেন চোরের মত সীগালে উঠেছে?

কি করবে এখন জ্যোতি? কি করা উচিত? উঠে গিয়ে দেখবে? কিন্তু—কিন্তু যদি চোখে পড়ে যায়? যদি দেখে ফেলে ওরা?

অদ্ভুত এক শব্দ কানে এল।

‘ঠাস্!’ করে আওয়াজ উঠল, পরক্ষণে কারও ব্যথায় গুঁড়িয়ে ওঠার।

ওপরের ডেকে হয়েছে আওয়াজ।

ল্যাবের কাছে ।

হঠাৎ সব পরিষ্কার বুঝে ফেলল জ্যোতি । ওরা মৎস্যকন্যাফে চুরি করে নিয়ে যেতে এসেছে!

মৎস্যকন্যা!

ব্যথায় গোঙাল কে? অবোধ, অসহায় মৎস্যকন্যা?

আতঙ্কে হাত-পা জমে এল হরর ক্লাব প্রধানের ।

বিশ

জোর এক কারেন্টের শক খেয়েছে যেন, এমনভাবে লাফ মেরে বিছানা ছাড়ল জ্যোতি । ভাগ্য ভাল উপমও জেগে ছিল, পুরো ব্যাপার লক্ষ করেছে ও নিজের কেবিন থেকে । জ্যোতির সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এল সে, দু'জনের কথা হলো চোখে চোখে । একসাথে ওপরের দিকে ছুটল ওরা ।

ডেকে উঠে দলা করে রাখা রশিতে পা বেধে পড়েই যাচ্ছিল জ্যোতি, রেলিঙ ধরে অনেক কষ্টে সামাল দিল । হাঁপাতে হাঁপাতে ল্যাবের দিকে দৌড় দিল । দরজার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল । উপম এসে পড়ল ওর ওপর ।

ঠিক আশঙ্কাই করেছিল জ্যোতি। কালো পোশাক পরা চার ছায়ামূর্তি মৎস্যকন্যার ট্যাঙ্ক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরে অতঙ্কে কুঁকড়ে আছে ওটা। সুন্দর চোখদুটো বিস্ফারিত। কোটর ছেড়ে এখনই বুঝি লাফিয়ে পড়বে।

লোকগুলোর একজনের হাতে খাটো একটা লাঠি। বৈশ মোটা। তার পায়ের কাছে অজ্ঞান হয়ে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে কে যেন!

ভাল করে তাকাতে চমকে উঠল জ্যোতি। ডক্টর নেয়ামূল ইসলাম!

আঁতকে উঠল উপম সশব্দে। ‘চাচা! চাচাকে মেরেছে ওরা!’

ঝট করে ঘুরে তাকাল চার ছায়ামূর্তি। সবার মুখ কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা।

‘ওরা চাচাকে মেরেছে!’ আবার চৈঁচিয়ে উঠল ও।

টোক গিলল জ্যোতি। লাঠিওয়ালা ছায়ামূর্তির দিকে তাকাল। ‘আপনারা কারা? কি-কি করছেন ওখানে?’

জবাব দিল না কেউ। ওপাশের একজন মেঝে থেকে মোটা সুতোর একটা ছোট জাল তুলে নিল, হাত দিয়ে ছড়িয়ে দিল মৎস্যকন্যার ট্যাঙ্কের মধ্যে। ওটার হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে গিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেল সে।

‘এই যে!’ চৈঁচিয়ে উঠল জ্যোতি। ‘কি করছেন?’

লাঠিওয়ালা লোকটা ঘুরে দাঁড়াল। ধমকে উঠল, ‘চোপ, ব্যাটা!’ লাঠি তুলে ভয় দেখাল দাঁতমুখ খিঁচিয়ে।

ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল জ্যোতি। অসহায়ের মত তাকিয়ে ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

থাকল। ওদিকে জাল টেনে তুলতে শুরু করেছে দু'জন, ভেতরে ছটফট করছে মৎস্যকন্যা।

‘ইইইইইই!’ ডাক ছাড়ল ওটা। ‘ইইইইইইইই!!’ মহাআতঙ্কে হাত ছুঁছে পাগলের মত। লেজ দিয়ে চটাশ চটাশ বাড়ি মারছে। কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না।

‘ওটাকে ছেড়ে দিন!’ অসহ্য রাগে আবার চেষ্টায়ে উঠল জ্যোতি। ‘ওটাকে—কেন—’

লাঠিওয়ালারা খিকখিক করে তাচ্ছিল্যের হাসি দিল। অন্যরা পাগলাই দিল না ওকে। তাকানই না।

উপম জ্যোতির পাশ কাটিয়ে ছুটে গেল চাচার কাছে। হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে ঝাঁকাতে লাগল জোরে জোরে।

জ্যোতি দৌড়ে বেরিয়ে এল। রেলিঙে ভর দিয়ে নিচের কেবিনের দিকে মুখ করে চেষ্টাতে লাগল, ‘মোকারম ভাই! মোকারম ভাই, জলদি আসুন!’

মোকারম হোসেন অল্প বয়সী। জোয়ান, তাগড়া। জ্যোতির ভরসা আছে সে চেষ্টা করলে এদের ঠেকাতে পারবে।

ওদিকে কয়েকজন মিলে ট্যাঙ্ক থেকে মৎস্যকন্যাকে তুলে ফেলেছে। ভীষণভাবে তড়পাচ্ছে ওটা, লেজ দিয়ে বাড়ি মেরে লোকগুলোকে ঘায়েল করার জন্যে লড়ছে মরিয়া হয়ে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। কেবল শক্তিই ক্ষয় হচ্ছে।

‘ইইইইইইইই!’ জ্যোতির দিকে তাকিয়ে আর্তচিৎকার করে উঠল ওটা। এত গভীর আর তীক্ষ্ণ আওয়াজ যে কানে তাল লেগে গেল ওর। পাকা মেঝেতে থালা ঘষলে যেমন অসহ্য কিচ্‌কিচ্‌

আওয়াজ হয়, ঠিক তেমনি সে আওয়াজ ।

‘ছেড়ে দিন! ওকে ছেড়ে দিন!!’ আবার চেষ্টা সে ।

পাতা দিল না লোকগুলো । বরং ওটার চিৎকার শুনে বিরক্ত হয়ে উঠল লাঠিওয়ালা । ‘কি অসহ্য! অ্যাই, কেউ থামাও ওটাকে । জলদি টুলারে নিয়ে চলো ।’

‘না!’ কিছু একটা করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল জ্যোতি । ‘ওটাকে নিতে পারবেন না আপনারা! ছেড়ে দিন!’ মোকারম হোসেন কোথায় গেল? কথার ফাঁকে ভাবছে ও, বারবার পেছন ফিরে তাকাচ্ছে । আসছে না কেন লোকটা?

দেরি হয়ে যাচ্ছে । মৎস্যকন্যাকে নিয়ে নিজেদের টুলারের দিকে হাঁটতে শুরু করেছে লোকগুলো ।

মাথা খারাপ হয়ে গেল জ্যোতির ।

পরিণতির কথা না ভেবেই ছুটে গেল লোকগুলোর দিকে । কি করবে জানে না, শুধু জানে ওদের ঠেকাতে হবে । সে যে করে হোক । ঠেকাতেই হবে ।

বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল লাঠিওয়ালা লোকটা । চোখমুখ পাকিয়ে লাঠি তুলল । ‘এক বাড়িতে ঘিলু বের করে দেব তোর!’ হুমকি দিল কঠিন গলায় । ‘ভাল চাস্ তো পালা!’

দাঁড়িয়ে পড়ল ও । কিন্তু হাল ছাড়ল না । চেষ্টা বলল, ‘ওটাকে ছেড়ে দিন! মৎস্যকন্যাকে ছেড়ে দিন!’

‘আরে রাখ! ছেড়ে দেব বলে এসেছি নাকি?’ হাসল সে । ‘নে, দেখে নে শেষ দেখা । আর কোনদিন দেখবি না ।’

রেলিঙ ধরে হাঁপাতে লাগল জ্যোতি । উত্তেজনায় কাঁপছে ।

ঘামছে দরদর করে। কিছু করতে পারছে না বলে নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে।

মৎস্যকন্যার আতঙ্কিত চিৎকার অসহ্য লাগছে ওর। চেষ্টা করে গলার রং ছিঁড়ে ফেলার ব্যবস্থা করেছে ওটা।

ওর অসহায় অবস্থা দেখে খুব কষ্ট হচ্ছে। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে জ্যোতিকে রক্ষা করেছে মৎস্যকন্যা, এখন তার প্রতিদান দেয়ার সময় এসেছে। তার জন্যে একটা কিছু করতেই হবে ওকে।

কিন্তু কি করবে?

কোন উপায় তো চোখে পড়ছে না।

ব্যাটা মোকারম হোসেন! মরণ ঘুম ঘুমিয়েছে নাকি? এতকিছু ঘটে যাচ্ছে, কিছুই টের পাচ্ছে না?

ঠিক আছে, ভাবল ও। আমিই করব যা করার। ওদের আমি—ওদের আমি এমন শিক্ষা দেব—ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে লম্বা করে দম নিল জ্যোতি। মাথা নিচু করে আবার লোকগুলোর দিকে দৌড় লাগাল ক্ষেপা ঝাড়ের মত।

একুশ

‘জ্যোতি!’ উপম আঁতকে উঠল। ‘কি করছিস!’

গুনতে পেল না ও, এক দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল লাঠিওয়ালার ওপর। ঘুমি ছুঁড়ল অন্ধের মত। কিন্তু কোথাও লাগল না। তার আগেই ওর হাত মুচড়ে ধরল লোকটা। লাঠি ফেলে আরেক হাতে কোমর ধরে তুলে ফেলল ওকে।

‘এতবড় সাহস!’ রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলল সে। ‘দাঁড়া, বাঁদর! তোর তেল বের করছি।’

দু’হাতে জ্যোতিকে শূন্যে তুলেই মৎস্যকন্যার ট্যাঙ্কে ছুঁড়ে মারল। ঝপাৎ করে পানিতে আছড়ে পড়ল ও, বুক বাতাসশূন্য থাকায় পানির ওপরে তোলার জন্যে হাঁসফাঁস করতে লাগল মরিয়া হয়ে। হৃৎপিণ্ড বিস্ফোরিত হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তে ভুশ্ করে ভেসে উঠল ও। ফুঁপিয়ে উঠে দম নিল।

সামলে নিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করল জ্যোতি, কিন্তু পারল না। ট্যাঙ্কের কিনারা বেশ উঁচু, কাঁচের গায়ে খামচাখামচি করা ছাড়া কোন লাভ হলো না।

ততক্ষণে মৎস্যকন্যাকে নিয়ে নিজেদের বোটে উঠে পড়েছে লোকগুলো। এখনই চলে যাবে।

মোকারম ভাই কোথায় গেল? ভেসে থাকার চেষ্টা করার ফাঁকে ভাবল জ্যোতি। এতক্ষণেও মানুষটার কোন সাড়া নেই কেন?

‘মোকারম ভাই!’ গলার সমস্ত শক্তি এক করে চেষ্টায়ে ডাকল ও। কাজ হলো না, সাড়া দিল না লোকটা।

একটু পর হঠাৎ দেখা দিল সে কাঁচের ওপাশে, রেলিঙের কাছে। উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রধান। ‘মোকারম ভাই, ওদের ঠেকান! মৎস্যকন্যাকে নিয়ে যাচ্ছে ওরা!’

শুনল না সহকারী। শুনলেও পাত্তা দিল না। তার চোখের সামনেই ওটাকে নিয়ে বোটে উঠে পড়ল তিন জন। স্টার্ট নিল ট্রলার।

চাউনি বিস্ফারিত হয়ে উঠল জ্যোতির ওদের একজনের সাথে লোকটাকে কথা বলতে শুনে। এ কি শুনছে জ্যোতি! এ কি করে সম্ভব? ভুল শুনছে না তো ও?

‘মৎস্যকন্যাকে বোটে তুলেছ?’ প্রশ্ন করল মোকারম হোসেন।

লাঠিওয়ালা মাথা দোলাল।

‘ভাল করেছে,’ সন্তুষ্ট হলো সে। ‘সাবধানে রাখতে হবে। আর আমার টাকা, এনেছ তো?’

‘নিশ্চয়।’

‘বেশ। চলো তাহলে, পালাই।’

বাইশ

বিস্ময়ের ধাক্কায় আরেকটু হলে এক ঢোক পানি খেয়েই ফেলেছিল জ্যোতি। সামলে নিয়ে কাশতে লাগল বেদম জোরে।

নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না ডক্টর নেয়ামুল ইসলামের সহকারী নিজে রয়েছে এই জঘন্য ষড়যন্ত্রের পেছনে। টাকার লোভে এতবড় জঘন্য একটা কাজ করতে পারে সে। অথচ এর ওপরেই কিনা ভরসা করেছিল জ্যোতি?

বোঝা গেল ওই ব্যাটাই এসবের মূল হোতা। টাকার লোভে নিজের সততা, বিশ্বস্ততা বিক্রি করে দিয়েছে সে। নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে।

মোকারম! মনে মনে ভাবল জ্যোতি। কি করে পারলে তুমি এমন এক নোংরা, ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র করতে?

যেন ওর মনের কথা বুঝতে পেরেই শেষ মুহূর্তে ঘুরে তাকাল সহকারী। জ্যোতির দিকে তাকিয়ে হাসল। শ্লাগ করে বলল, ‘মন খারাপ করার কিছু নেই, জ্যোতি। সবাই উন্নতি চায়, টাকা চায়। আমিও চেয়েছি। সার্কাস কোম্পানি মাত্র পঞ্চাশ হাজার দিতে ভয়ানক দুঃস্থ

চেয়েছিল, অথচ এরা আমাকে দুই লাখ দিচ্ছে।’

আবার হাসল সে। ‘তুমি নিশ্চয় অঙ্ক বোঝো, দুই লাখ টাকার বর্তমান বাজার দর বোঝো। এত টাকা ছাড়ি কি করে, তুমিই বলো? সুযোগ পেলে তুমিও নিশ্চয় ছাড়তে না, ছাড়তে?’

ঘণায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল ওর। চোঁচিয়ে বলল, ‘বিশ্বাসঘাতক! বেঈমান! তুমি এতবড় শয়তান, জানতাম না।’

‘এখন তো জানলে,’ নির্বিকার চেহারায় হাসল মোকারম হোসেন। ঘুরে ট্রলারে ওঠার জন্যে তৈরি হলো।

এমন সময় মেঝে থেকে তড়াক করে উঠে বসলেন বিজ্ঞানী। বোঝা গেল জ্ঞান আগেই ফিরেছে তাঁর, তবু শুয়ে ছিলেন সুযোগের অপেক্ষায়। দৌড়ে গিয়ে সহকারীকে ধরার জন্যে হাত বাড়ালেন। ধরে ফেললেন। লোকটাকে নিয়ে হুঁমুড় করে আছড়ে পড়লেন ডেকে।

নিচে পড়ল লোকটা, মাথায় বেকায়দা চোট লাগতে ককিয়ে উঠল। পরক্ষণে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল সে, সঙ্গীদের লক্ষ করে চোঁচিয়ে বলল, ‘ধরো লোকটাকে!’

দুই কালো পোশাকধারী ফিরে এল সীগালে। বিজ্ঞানীকে ঠেসে ধরল মেঝের সাথে। ‘কি করব একে নিয়ে?’ প্রশ্ন কবল একজন।

‘ট্যাক্সের মধ্যে ফেলে দাও!’ মাথার ব্যথা পাওয়া জায়গা ডলতে ডলতে খেঁকিয়ে উঠল মোকারম।

তাই করল ওরা। সময় নষ্ট না করে নির্দেশ পালন করল লোকগুলো। বিজ্ঞানীকে চ্যাঙদোলা করে ট্যাক্সের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল। তারপর উপমকেও।

নিচু গলায় লোকদুটোকে আরও কি যেন বলল মোকারম
হোসেন, তারপর এক লাফে উঠে পড়ল ট্রলারে।

তেইশ

‘মোকারম!’ হাহাকারের মত শোনাৎল বিজ্ঞানীর গলা। ‘তুমি এত নীচ
হতে পারো না। এ-কাজ তুমি করতে পারো না। মৎস্যকন্যাকে
নিয়ে যেতে দিয়ো না, ঠেকাও ওদের। ওকে বাঁচাতে পারবে না
ওরা।’

‘দুঃখিত, স্যার,’ সরাসরি প্রফেসরের মুখের দিকে তাকাতে
ব্যর্থ হয়ে আরেক দিকে ফিরে বলল সে। এখন আর তা সম্ভব নয়।
ওরা তাহলে আমাকেও খুন করবে।’

ঘুরে দাঁড়াল লোকটা। ধীর পায়ে হেঁটে গিয়ে ট্রলারে উঠল।

‘বেঈমান!’ দাঁত কিড়মিড় করে জ্যোতি বলল।

সেই দুই লোক এগিয়ে এল। অসহায়ের মত জ্যোতিকে
দেখলেন বিজ্ঞানী। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওপরের ঢাকনা
লাগিয়ে দিল ওরা, হুক লাগিয়ে দিল দ্রুত হাতে। বাকি দু’জনও
সীগালে উঠে এল এবার।

আতঙ্কিত হয়ে উঠল জ্যোতি ও উপম। রাজা কোথায় গেল?
ঘুমাচ্ছে? ঢাকনা খুলতে ওর সাহায্য দরকার। বাইরে থেকে কেউ
হুক খুলে না দেয়া পর্যন্ত বের হতে পারবে না ওরা কোনমতেই।

পরমুহূর্তে কলজে উড়ে গেল জ্যোতির। ল্যাবের প্লাইউডের
পার্টিশন একের পর এক লাথি মেরে খসিয়ে ফেলছে লোকগুলো।
কাজটা সেরে চারজনে মিলে ট্যাক্সটাকে ঠেলে নিয়ে চলল বোটের
কিনারার দিকে। একই সাইজের চাকা লাগানো ট্রলির ওপর ছিল
ওটা; কাজেই খুব একটা অসুবিধে হলো না।

লাঠিওয়ালা লোকটা কি যেন বলল, হেসে উঠল অন্যরা।
ভেতরে আটকা পড়া তিনজন বিপদ টের পেয়ে ছটফট করতে
লাগল। কিন্তু বিফলে গেল সব। কোন কাজ হলো না।

একদম কিনারায় ট্যাক্স এনে একটু থামল লোকগুলো।

‘কি করছে ওরা?’ ভয়ে ভয়ে সাগরের দিকে তাকাল জ্যোতি।
মনের মধ্যে ভয়ঙ্কর এক সন্দেহ উঁকি মারছে।

‘ট্যাক্স খুলে দাও,’ বিজ্ঞানী চেষ্টা করে বললেন। ‘আমাদের বের
হতে দাও। খোলো ট্যাক্স।’

জবাব দিল না লোকগুলো। পরস্পরের দিকে তাকাল, তারপর
একযোগে এগিয়ে এল।

যাক, হাঁফ ছাড়ল জ্যোতি। নিশ্চয় ও ভুল ভেবেছে। ওরা নিশ্চয়
ট্যাক্স খুলে দেবে এখন।

চার কালো পোশাকধারী ট্যাক্স ধরল। তারপর আচমকা ঠেলে
দিল সাগরের দিকে। ঝপাৎ শব্দে পানিতে আছড়ে পড়ল ওটা।
কাঁচের দেয়ালে জোরে মাথা ঠুকে গেল ওদের সবার।

কিছু সময় ভেসে থাকল ট্যাঙ্ক, তারপর আস্তে আস্তে তলিয়ে যেতে আরম্ভ করল। আঁধার আরও ঘন হয়ে চেপে এল।

চব্বিশ

ভেতরে পাগলের মত লাফঝাঁপ শুরু করল সবাই। জ্যোতি গায়ের জোরে একের পর এক ঘুষি মারতে লাগল ঢাকনায়, কিন্তু একচুল নড়ছে না ওটা। অনড়।

বিজ্ঞানী কাঁধ দিয়ে দেয়ালে গুঁতো মারতে লাগলেন মরিয়া হয়ে। কিছুতে কিছু হচ্ছে না। উপম ভয়ে ফোঁপাচ্ছে।

পানি ঢুকে প্রায় ভরে এসেছে ট্যাঙ্ক। ওপরে যে সামান্য ফাঁকা জায়গা আছে, ওখানে মাথা তুলে রেখে দম নেয়ার জন্যে সংগ্রাম করছে সবাই।

কাৎ হয়ে একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে ট্যাঙ্ক, আঁধার ক্রমে গাঢ় হচ্ছে।

‘ঢাকনা ভাঙতে হবে!’ চোঁচিয়ে বললেন চাচা। ‘জ্যোতি, উপম, ধরো আমার সাথে! ওপর দিকে ধাক্কা মারো!’

গায়ের জোরে ধাক্কা, গুঁতো, ঘুষি মেরে চলল সবাই মিলে। তবু
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

একচুল নড়ল না ঢাকনা। বিশ মনি পাথরের মত জেঁকে বসেই থাকল।

নেমেই চলেছে ওরা। কালির মত কালো আঁধার হেঁকে ধরছে ওঁদের চারদিক থেকে। চাঁদের যে সামান্য আলোর আভাস ছিল, তাও একসময় বিলীন হয়ে গেল।

ডুবছে ওরা। ডুবছে।

ভেতরে এখনও সামান্য বাতাস আটকে আছে বলে রক্ষা, নইলে এতক্ষণে দম আটকে মরতে হত সবাইকে।

শব্দ করে কেঁদে উঠল উপম। ‘আমরা মরে যাচ্ছি!’ তীক্ষ্ণ, আতঙ্কিত গলায় চেষ্টা করে উঠল। ‘হায় আল্লাহ! মরে যাচ্ছি আমরা!’

কোন সান্ত্বনার কথা শোনা গেল না। অভয় দিল না কেউ। মৃত্যুভয় চেপে ধরেছে প্রত্যেককে, কে কাকে সান্ত্বনা জানায়?

দুর্বোধ্য কি যেন বলে উঠলেন বিজ্ঞানী, আবার গায়ের জোরে ঘুষি মেরে বসলেন ঢাকনার ওপর। ফলাফল আগের মতই।

ট্যাঙ্কের জোড়ায় জোড়ায় হাতড়াচ্ছে জ্যোতি, কোথাও যদি কোন দুর্বল জায়গা থাকে, সেই আশায়। নেই।

মজবুত কাঠের ফ্রেম আর পুরু কাঁচ দিয়ে এমনভাবে মজবুত করা হয়েছে জিনিসটা, কোথাও কোন দুর্বল জায়গা নেই।

থাকার কথাও না। তেমন হলে ভেতরের পানির প্রতি মুহূর্তের চাপে অনেক আগেই ভেঙে পড়ত কাঁচের দেয়াল, অথবা লীকেজ দেখা দিত কোথাও না কোথাও।

হঠাৎ কি যেন একটা হাতে ঠেকতে কলজে লাফিয়ে উঠল ওর। ছোটখাট বাঁপ বা পাল্লা জায়গামত ধরে রাখার ল্যাচ! বাইরের দিক

ভেতরের অংশ।

ওটা ধরে খানিকটা টানা-হ্যাঁচড়া করল ও গায়ের জোরে। কিন্তু কাজ হলো না, জ্যাম হয়ে আছে।

‘চাচা!’ চেষ্টায়ে উঠল ও। ‘এই দেখুন, কি যেন একটা। খোলা যায় বোধহয়।’

‘কই, দেখি!’ ওটা ধরলেন তিনি। গায়ের জোরে খোলার চেষ্টা করলেন। হতাশ হয়ে মাথা দোলালেন হাল ছেড়ে দিয়ে। ‘হবে না।’

হঠাৎ কি মনে হতে পকেটে হাত ভরে দিলেন। চেষ্টায়ে উঠলেন। ‘পেয়েছি!’

‘কি?’ জ্যোতি বলল রুদ্ধশ্বাসে।

উত্তর না দিয়ে চাবির রিঙ নিয়ে নতুন উদ্দমে বাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। রিঙের মধ্যে ল্যাচের এক মাথা ভরে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে টানলেন।

‘খুলছে!’ চেষ্টায়ে উঠলেন বিজ্ঞানী।

বাঁচার আশা ফিরে এল সবার মধ্যে। নীরবে হেসে উঠল জ্যোতি। উপমের মুখেও হাসি ফুটল।

‘হ্যাঁ, খুলেছে!’ বলেই ল্যাচ ধরে হ্যাঁচকা টান দিলেন ডক্টর ইসলাম। ভেঙেই গেল ওটা।

‘উফ, বাঁচলাম!’ বলল উপম।

‘এসো, সবাই মিলে হাত লাগাও,’ বিজ্ঞানী বললেন।

তিনজন একসাথে ঢাকনা ধরে ঠেলা দিল ওপরদিকে।

একবার।

দু’বার।

তিনবার।

কিন্তু ওটা একচুল নড়ল না। চোখ কুঁচকে আঙুলের মাথা দিয়ে ল্যাচ পরীক্ষা করে দেখলেন উপমের চাচা। চেহারা বোকা বোকা হয়ে উঠল।

‘কি হলো?’ প্রশ্ন করল জ্যোতি।

‘ল্যাচ পুরো ভাঙেনি। গোড়া ভেতরে রয়ে গেছে,’ মাথা দোলালেন। ‘ওটুকু বের করার উপায় নেই।’

চুপ করে গেল সবাই। কোন আওয়াজ নেই ট্যাক্সের ভেতর। ফাঁক দিয়ে নিঃশব্দে পানি ঢুকছে, ওপরের ফাঁক বুজে আসছে একটু-একটু করে।

আর অল্পক্ষণ আছে। তারপর পুরোটা ভরে যাবে। সম্পূর্ণ বাতাসশূন্য হয়ে পড়বে ট্যাক্স। নিঃশ্বাস নেয়ার উপায় থাকবে না। অক্সিজেনের অভাবে ছটফট করে মরবে সবাই। মরে পড়ে থাকবে ওরা সাগরের তলায়।

কেউ দেখবে না।

কেউ জানবে না।

শেষবারের মত ট্যাক্সের প্রতিটা জোড়া হাতড়ে দেখল জ্যোতি। যদি কোথাও আর কোন দুর্বল জায়গা পাওয়া যায়—যদি—

কিন্তু না।

নেই।

একেবারে দুর্ভেদ্য কফিন ট্যাক্সটা।

হাল ছেড়ে দিল জ্যোতি, ঠিক তখনই একটা আওয়াজ কানে এল।

পাঁচিশ

‘কিসের আওয়াজ?’ প্রশ্ন করল ও।

উপম কান খাড়া করল।

‘কই?’ বললেন বিজ্ঞানী।

সবাই কান খাড়া করল। আওয়াজটা দূরগত, অদ্ভুত। খুব ক্ষীণ।

নিশ্চয় অনেক দূর থেকে আসছে।

খুব তীক্ষ্ণ। মেঝেতে থালা ঘষলে যেমন শোনায, তেমনি।

‘সাইরেনের মত আওয়াজ না?’ আপনমনে বললেন নেয়ামুল ইসলাম। ‘অনেকগুলো সাইরেন!’ হতভম্ব চেহারা হলো তাঁর।

উঁচু-নিচু পর্দার আওয়াজ। ভীতিকর।

বাড়ছে, এগিয়ে আসছে।

খুব কানে লাগছে এখন আওয়াজটা। শিরশির করছে গায়ের মধ্যে।

একেবারে আচমকা ট্যাক্সের চারদিকে অনেকগুলো গাড়ি ছায়ার নড়াচড়া দেখতে পেল জ্যোতি। কাঁচের গায়ে নাক ঠেকিয়ে তাকাল সবাই।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন।

‘কি ওগুলো?’ বললেন উপমের চাচা। ‘এরকম শব্দ—কিসের? এমন আজব শব্দ আগে কখনও শুনিনি তো!’

‘চারদিক থেকেই তো আসছে,’ বলল জ্যোতি। আঁধার ভেদ করে ছায়াগুলো কিসের বোঝার চেষ্টা করছে।

বেশ কিছু সময় কেটে গেল। তারপর হঠাৎ করে একটা ছায়া এগিয়ে এল ট্যাক্সের দিকে। সোজা জ্যোতির মুখের কয়েক ইঞ্চি ওপাশে স্থির হলো ওটার মুখ। আঁতকে উঠল ও।

সভয়ে পিছিয়ে এল।

আরও কয়েকটা ছায়া এসে পড়ল। প্রকাণ্ড ট্যাক্স ঘিরে ফেলল ওরা। অনেকগুলো মেয়েলী মুখ। অপূর্ব সুন্দর চেহারা।

সবুজ, বড় বড় চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে আছে।

‘মৎস্যকন্যা!’ কোনমতে উচ্চারণ করল জ্যোতি।

একটা-দুটো নয়, কয়েক ডজন ওরা।

‘ওরে বাবা!’ বলে উঠল উপম। ‘এগুলো—এগুলো—ঘটনা—!’

লেজ দিয়ে পানিতে মৃদু বাড়ি মারছে প্রাণীগুলো।

মাথায় ঘন চুল, কিন্তু অন্ধকারে রঙ বোঝা যাচ্ছে না, মুখের চারপাশে কিল্বিল্ করছে সুতোর মত, সরু সাপের মত।

ওদের ধাক্কায় দুলে উঠল ট্যাক্স।

‘কি চায় ওরা?’ আতঙ্কে চেষ্টা করে উঠল উপম।

‘ওরা রেগে আছে,’ ফিস্‌ফিস্ করে বললেন প্রফেসর। ‘মনে হয় প্রতিশোধ নিতে এসেছে।’

জ্যোতি বোকার মত তাকিয়ে থাকল। ওরও সেরকমই মনে হচ্ছে। ট্যাক্সের চারদিকে গোল হয়ে ভাসছে মৎস্যকন্যার দল।

থেকে থেকে ছুটে আসছে ট্যাঙ্কের দিকে। হাত দিয়ে, লেজ দিয়ে
বাড়ি মারছে।

হ্যাঁ, বুঝে ফেলেছে জ্যোতি কেন এসেছে ওরা।

‘প্রতিশোধ,’ বিড়বিড় করে বলে উঠল। ‘প্রতিশোধ নিতে
এসেছে ওরা। ওদের এক সঙ্গিনীকে আমরা ছিনিয়ে নিয়েছি, ওরা
এবার তার শোধ নেবে।’

ছায়াবিশ

অনেক জোড়া হাত এগিয়ে এল ট্যাঙ্কের দিকে। চারদিক থেকে
আঁকড়ে ধরল। নড়ে উঠল ট্যাঙ্ক।

উপম আঁতকে উঠল। ‘ওরা এবার আমাদের পাতালপুরিতে
নিয়ে যাবে।’

ভয়ে গলায় দম আটকে এল জ্যোতির। চোখ বড় করে
হাতগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। নড়তে সাহস হচ্ছে না।

আবার নড়ে উঠল ট্যাঙ্ক। ওপরদিকে উঠতে শুরু করল
ধীরগতিতে। কাঁচের দেয়াল ধরে নিজেদের সামান দিল সবাই।

‘কি হচ্ছে!’ উপম গুণ্ডিয়ে উঠল।

‘ওরা আমাদের ওপরে নিয়ে যাচ্ছে!’ আনন্দে অস্থির হয়ে উঠল জ্যোতি। ‘ওপরে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের!’

চেহারায় স্বস্তি ফিরে এল প্রফেসরের। ফাঁস করে দম ছাড়লেন। ‘ওফ, বাঁচলাম! ওরা তাহলে প্রতিশোধ নিতে আসেনি।’

ট্যাক্স ঠেলে ওপরে তুলে আনল ওরা। ভুশ্ করে পানির ওপরে উঠে পড়ল ওপরের অংশ। চাঁদের আলো ঢুকল ভেতরে।

মৎস্যকন্যাদের ছোট ছোট হাত বাইরের হুক ধরে টানা-হ্যাঁচড়া করছে দেখতে পেল জ্যোতি। নিজেদের ভাষায় কথা বলছে ওরা পরস্পরের সাথে।

মৃদু শব্দ করে খুলে গেল হুক। একটানে ওরা ঢাকনা খুলে ফেলল। ট্যাক্স ঠেলে সীগালের গায়ের সাথে এনে ঠেকাল।

উষ্ণ নৈয়ামূল ইসলাম আনন্দে হেসে উঠলেন। লম্বা করে দম নিয়ে এদিক-ওদিক তাকালেন।

জ্যোতি এক লাফে বোটে উঠে পড়ল। তারপর উঠল উপম। দু’জনে ধরে বিজ্ঞানীকে উঠতে সাহায্য করল।

হঠাৎ করে জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গেল যেন সবার। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বেঁচে ফিরে আসার প্রতিক্রিয়ায় কাঁপুনি উঠে গেল সারা দেহে।

রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতি। চুল, কাপড় বেয়ে পানি ঝরছে ডেকে টপটপ করে।

নিচে ভাসছে কাঁচের ট্যাক্স। চারদিক থেকে ভেতরে পানি ঢুকছে। ডুবে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

ওটার চারপাশে কিলবিল্ করছে কয়েকজন মৎস্যকন্যা। নানান

বয়সের, ছোট-বড়। বিচিত্র শব্দ করছে মুখ দিয়ে। ওপরদিকে তাকিয়ে আছে।

‘ধন্যবাদ!’ দম ফিরে পেয়ে বিড়বিড় করে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাল জ্যোতি। ‘অনেক ধন্যবাদ তোমাদের!’

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই নিয়ে ওরা দু’রার আমার প্রাণ বাঁচাল, ভাবল জ্যোতি। ওদের কাছে আমার ঋণের কোন সীমা নেই। এ-ঋণ শোধ করাও যায় না। তবু কিছু করতে হবে ওকে বিনিময়ে।

করতেই হবে।

নিখোঁজ মৎস্যকন্যাকে উদ্ধার করতে হবে। যে করেই হোক।

বিজ্ঞানীর দিকে ঘুরে তাকাল ও। ‘চাচা, মৎস্যকন্যাকে বাঁচাতে হবে আমাদের। মোকারম হোসেনের হাত থেকে উদ্ধার করতে হবে ওটাকে।’

‘হ্যাঁ,’ উপম বলল। ‘অবশ্যই ওটাকে বাঁচাতে হবে, চাচা।’

‘কিন্তু কি করে?’ অসহায়ের মত এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন প্রফেসর, যেন ট্রলারটা খুঁজছেন। ‘ওকে কোথায় নিয়ে গেল হারামজাদা কে জানে? কেমন করে বুঝব কোনদিকে গেছে ট্রলারটা?’

কিছু বলতে যাচ্ছিল জ্যোতি, পেছনে পায়ের শব্দে ঘুরে তাকাল। রাজা এসে দাঁড়িয়েছে খোলা ঠেকে। চোখে ঘুম। ‘ওপরে এত কথা হচ্ছে কিসের?’ জিজ্ঞেস করল জড়ানো গলায়। ‘কি—’ থেমে গেল। চোখ বড় করে এক এক করে তাকাল চুপচুপে ভেজা সবার দিকে।

‘কি হয়েছে, জ্যোতি?’ জবাব না পেয়ে অসহায়ের মত উপমের ভয়ানক দৃষ্ণপ

দিকে তাকাল। কৌতূহলে বুক ফেটে যাচ্ছে।

‘পকেটে গাম আছে?’ বলল জ্যোতি।

‘অবাক হলো ও। ‘কি?’

‘বাবল গাম। পকেটে আছে? একটা দে দেখি, খেলে বুদ্ধি
খোলে কিনা পরীক্ষা করে দেখি।’

কথা না বাড়িয়ে একটা বের করে দিল ও। মুখে পুরে চিবাতে
শুরু করল প্রধান। সাগরের দিকে তাকিয়ে চিন্তায় ডুবে থাকল।

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। ‘চাচা!’ চৈচিয়ে উঠল। ‘ইউরেকা!’

‘কি?’

‘পথ পেয়েছি।’

উপম আর রাজা নিচু গলায় কথা বলছিল। ওরাও তাকাল।

‘কি?’ আবার প্রশ্ন করলেন মেরিন বায়োলজিস্ট।

সাতাশ

জবাব না দিয়ে পানির দিকে ঝুঁকল জ্যোতি। মৎস্যকন্যাদের সংখ্যা
আরও বেড়েছে মনে হলো। ঘুরঘুর করছে। কাঁচের ট্যাঙ্ক ডুবে গেছে
কখন যেন।

‘আমাদের সাহায্য করো,’ মিনতি করল জ্যোতি ওদের উদ্দেশে। ‘তোমাদের বন্ধুকে ওরা কোথায় নিয়ে গেছে জানতে চাই আমরা। দয়া করে সাহায্য করো, নিয়ে চলো আমাদের সেখানে।’

দম বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগল ও। ওরা কি বুঝতে পেরেছে জ্যোতির আবেদন? সাহায্য করবে?

জোর আলোড়ন উঠল পানিতে। একটা প্রথমে তীক্ষ্ণ শিস বাজাল, তারপর আরেকটা। এক মুহূর্ত পর সবকটা একযোগে গুরু করল।

ওদের মধ্যে থেকে একটা সামনে এগিয়ে এল। অন্যগুলোর তুলনায় বেশ বড় এটা, লম্বা লেজ। বয়সও বোধহয় একটু বেশি।

সীগালের কাছে এসে মুখ তুলল ওটা। শিসের সাথে আরেক ধরনের তীক্ষ্ণ আওয়াজ করতে লাগল গলা দিয়ে।

সাথে সাথে সাড়া পড়ে গেল অন্যগুলোর মধ্যে। অবাক হয়ে খেয়াল করল জ্যোতি, ওটার নির্দেশে একটার পেছনে আরেকটা লাইন দিয়ে দাঁড়াতে বাস্তু হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে গেল লাইন।

‘কি করছে ওরা?’ বললেন বিজ্ঞানী।

‘মনে হয় আমাদের পথ দেখাতে তৈরি হচ্ছে,’ জ্যোতি বলল চিন্তিত গলায়। গাল চুলকাল। ‘কিন্তু ওরা কি করে বুঝবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে ওদের সঙ্গিনীকে?’

‘ওরা নিশ্চয় ওদের সোনার সঙ্কেত ব্যবহার করবে।’

অবাক হলো জ্যোতি। ‘তিনি মাছের মত সেই সঙ্কেত?’

ডক্টর ইসলাম মাথা দোলালেন। ‘হ্যাঁ। ওরা নিশ্চয় নিজেদের

মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করে ঠিকই জায়গামত নিয়ে যেতে পারবে আমাদের।’

‘চাচা!’ উত্তেজিত গলায় উপম ডেকে উঠল। ‘দেখুন, ওরা চলে যাচ্ছে!’

‘চলে যাচ্ছে না, আমাদের পথ দেখাতে শুরু করেছে।’

টেউয়ের মাথায় চড়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে এক ঝাঁক মৎস্যকন্যা। সীগালের কাছ থেকে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ওদের তৈরি টেউ। চিক্চিক্ করছে।

‘চাচা, জলদি!’ ব্যস্ত হয়ে উঠল জ্যোতি। ‘চলুন, ওদের পেছন পেছন যেতে হবে। বোট ছাড়ুন!’

‘কিন্তু—’ দ্বিধা করতে লাগলেন তিনি। ‘আমাদের এই ক’জনের যাওয়া বোধহয় ঠিক হবে না। ওরা পাঁচজন, আর আমরা মাত্র—’ কথা শেষ না করে অসহায়ের মত সাগরের দিকে তাকালেন। এর মধ্যে বেশ দূরে চলে গেছে ওগুলো। ছোট ছোট দেখাচ্ছে।

‘কিন্তু তাই বলে বসে থাকার উপায় নেই আমাদের। জলদি করুন! ওরা বেশি দূরে চলে গেলে সমস্যা হয়ে যাবে।’

তবু একটু ইতস্তত করলেন প্রফেসর। ‘বেশ, চলো তাহলে।’

তাড়াতাড়ি ডিঙিতে উঠল সবাই। এঞ্জিন স্টার্ট দিলেন তিনি, জ্যোতি বাঁধন খুলে দিল। রওনা হয়ে পড়ল ওটা।

দূর থেকে মৎস্যকন্যার ঝাঁককে অনুসরণ করতে লাগলেন ডক্টর ইসলাম। পেছনে ডিঙির সাড়া পেয়েই হয়তো নিজেদের চলার গতি আরও বাড়িয়ে দিল ওরা। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সাঁতার কাটছে। মেঘের নিচে ঢাকা পড়ে গেছে চাঁদ।

এক নাগাড়ে পনেরো কি বিশ মিনিট চলার পর সামনেই একটা টিলামত দেখে গতি কমালেন ডক্টর ইসলাম। টিলার নিচে বড় এক গুহা আছে মনে হলো।

সেদিকে এগোচ্ছে ঝাঁকটা।

আরেকটু এগোতেই মেঘ সরে গেল চাঁদের ওপর থেকে। আলোয় সামনেটা পরিষ্কার দেখা গেল। গুহাই ওটা। এবং তার সামনে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে সেই ট্রলার!

অন্ধকারে ডুবে আছে।

চট করে এঞ্জিন অফ করে দিলেন বিজ্ঞানী। নইলে ওরা শুনে ফেলবে।

গতি কমতে কমতে একসময় থেমে দাঁড়াল ডিঙি। নীরবে সবাই ট্রলারটার দিকে তাকিয়ে থাকল। কোন সাড়াশব্দ নেই, কোন নড়াচড়া নেই।

‘ওরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে,’ বিজ্ঞানী বললেন আপনমনে।

‘ঘুমিয়ে পড়েছে!’ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকাল জ্যোতি। ‘কি বলছেন? যা ঘটিয়েছে, তারপর মোকারমের অন্তত ঘুম আসতে পারে না আজ।’

মাথা দোলালেন তিনি। ‘নিশ্চয় পারে। এতগুলো টাকা রোজগার হলো, তার ওপর জানে আমরাও মরে গিয়ে ওর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছি, তাহলে কেন ঘুম আসবে না? বরং বেশি আসবে।’

‘কিন্তু ওরা গেল কোথায়?’ চাপা গলায় প্রশ্ন করল উপম।

‘কি?’ জ্যোতি ঘুরে তাকাল।

‘মৎস্যকন্যা। কোথায় গেল ওরা? একটাকেও তো দেখছি না।’

চোখ কুঁচকে সামনে তাকাল সবাই। তাইতো! কোথায় গেল?

কোন সাড়া নেই। একটাও ছোট ঢেউ নেই।

ওরা না থাকুক, ভাবল হরর ক্লাব প্রধান। যাদের খোঁজে আসা,
তাদের তো পাওয়া গেল! ওতেই চলবে।

কিন্তু সমস্যাও আছে একটা। সেটা হলো এরপর কি?

কিভাবে মৎস্যকন্যাকে উদ্ধার করবে ওরা?

আটাশ

বাতাস একদম স্থির। সাগরের ঢেউ কমে এসেছে। তবে একেবারে
মিলিয়ে যায়নি। নিচু, টানা ঢেউ নাচছে।

তার মাথায় অল্প অল্প দোল খাচ্ছে সামনের ট্রলারটা। মানুষের
কোন সাড়া নেই ওটায়। নীরব, নিস্তব্ধ।

‘এতগুলো মৎস্যকন্যা,’ বিড়বিড় করে আপনমনে বলে উঠল
রাজা। ‘কোথায় গেল ওরা? কোন সাড়া নেই কেন?’

জ্যোতিও ভাবছে একই কথা। চাঁদের আলোয় তন্দ্র তন্দ্র করে
চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ওদের। কোন চিহ্নই নেই ওগুলোর। স্বেফ

উধাও হয়ে গেছে পানির বুক থেকে। পাতালপুরিতে চলে গেছে?

অনেকক্ষণ পর, হঠাৎ করে পানিতে নড়াচড়া চোখে পড়ল জ্যোতির। ট্রলারটার কাছেই। বুদ্বুদ উঠছে।

নীরবে জায়গাটা চাচাকে দেখাল ও। মাথা ঝাঁকালেন তিনি, দাঁড় বেয়ে নিঃশব্দে সেদিকে ডিঙি নিয়ে চললেন।

জ্যোতি, উপম, রাজা, সবাই একভাবে বুদ্বুদগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না, নিঃশ্বাস নিতেও ভুলে গেছে। বুদ্বুদগুলো কিসের তৈরি, বোঝার চেষ্টা করছে।

ট্রলারের বেশ কাছে এসে পড়েছে বোট, এমন সময় চাঁদের আলোয় একটা মাথা পরিষ্কার দেখতে পেল জ্যোতি। সোনালি, দীর্ঘ চুল চক্‌চক্ করছে চাঁদের আলো মেখে।

‘মৎস্যকন্যা!’ উত্তেজিত হয়ে উঠল ও। ফিস্‌ফিস্ করে আবার বলল, ‘ওই তো সেই মৎস্যকন্যা! চাচা, ওই যে!’

সত্যি তাই। ট্রলারের পেছনে শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়েছে ওটাকে। সাগরেই ভাসছে, অথচ অসহায়ের মত। দু’হাত পেছনে বাঁধা, কোমরও বাঁধা। কিছু করার নেই দড়ির সীমানা পর্যন্ত ঘুরে বেড়ানো ছাড়া।

খুশি হয়ে উঠল জ্যোতি। ‘ওকে রাখার মত ট্যাঙ্ক নেই ব্যাটাদের, তাই বাধ্য হয়ে সাগরে বেঁধে রেখেছে।’

‘গুড!’ মাথা ঝাঁকালেন বিজ্ঞানী। ‘ভালই হয়েছে।’

আরও কিছু বুদ্বুদ উঠল ওটার চারদিকে। একে একে মাথা তুলল আরও অনেক মৎস্যকন্যা, সঙ্গিনীকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

লেজ পানির ওপরে তুলে মনের আনন্দ প্রকাশ করছে ওরা।

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

তবে নিঃশব্দে। শব্দ হলে নতুন বিপদ দেখা দিতে পারে বুঝে ফেলেছে।

একটু পর দেখা গেল আনন্দ নয়, অন্য কিছু করছে আসলে ওরা। বন্দি সঙ্গিনীকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে বাঁধন খুলে।

এই জন্যেই এত আলোড়ন।

‘ওটাকে ছাড়াবার চেষ্টা করছে ওরা,’ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল জ্যোতি।

‘দারুণ ব্যাপার তো!’ রাজা বলল টপ্‌ কুরে একটা গাম মুখে পুরে।

উপম হাসল নীরবে। ‘ঘটনা প্যাঁচ লেগে গেছে।’

‘দূর ব্যাটা! প্যাঁচ বরং খুলছে।’

জ্যোতি হাসল ওদের তর্ক শুনে। ‘কি করা যায় এখন?’ পেছন ফিরে বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করল ও।

‘দেখা যাক ওরা কাজটা শেষ করতে পারে কিনা,’ তিনি বললেন। ‘যদি পারে ভাল। না পারলে আমরা যাব। বোসো, আরও কিছুক্ষণ দেখি।’

মাথা বাঁকাল প্রধান। ‘ব্যাটারা টেরও পাবে না কি ঘটে গেছে।’

‘আমিও তাই ভাবছি। যদি নীরবে কাজ সারা যায়, তাহলে আর এগোব না। সরে পড়ব ওদের অজান্তে।’

‘কিন্তু মোকারম হোসেন! ওর কি ব্যবস্থা করবেন?’

পুরু চশমার পেছনে চাউনি কঠিন হয়ে উঠল ডক্টর ইসলামের।

‘ওকে? ওকে আমি পুলিশে দেব।’

পরিকল্পনাটা মনে ধরল জ্যোতির। ওকে পুলিশে দেয়া উচিত।

জেল হওয়া উচিত মোকারমের মত লোভী, বেঈমানের।

সামনে তাকাল। কাজ তখনও শেষ হয়নি মৎস্যকন্যাদের।
জলদি করো! মনে মনে বলল ও। জলদি! কেউ দেখে ফেললে
বিপদ।

বিজ্ঞানীর দিকে ঘুরল। ‘চাচা, ওরা দেরি করে ফেলছে। আমি
খুলে দিয়ে আসি বাঁধন।’

জবাব দেয়ার জন্যে মুখ খুলেছিলেন বিজ্ঞানী, পারলেন না।
প্রথমে ফস্ করে ম্যাচের কাঠি জ্বলে উঠল ট্রলারে। একটা বাতি
ধরাল কেউ।

পরক্ষণে কেউ মোটা গলায় হাঁক ছাড়ল। ‘অ্যাই, কে ওখানে!
কারা তোমরা, কি চাও!’

একটা জোরাল টর্চ লাইটের আলো এসে পড়ল ডিঙির ওপর।

উনত্রিশ

জ্যোতি চট্ করে হাত তুলে চোখ আড়াল করল। ধড়াস্ ধড়াস্
করছে বুকের মধ্যে। আলোর পেছনে সেই লাঠিওয়ালাকে দেখতে
পাচ্ছে ও, কড়া চোখে এদিকে তাকিয়ে আছে।

‘কারা তোমরা?’ আবার প্রশ্ন করল লোকটা।

জবাব নেই।

আচমকা ধরা পড়ে ঘাবড়ে গেছে সবাই। ডক্টর নেয়ামুল ইসলামও অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছেন। এমন অপ্রত্যাশিত ঝামেলা আশঙ্কা করেননি তিনি।

কি করবেন বুঝে পাচ্ছেন না।

জ্যোতি তাকিয়ে আছে বুঝতে পেরে সতর্ক হয়ে উঠল লোকটা, টর্চ নিভিয়ে দিল। একটু পর আবার যখন জ্বালল, তখন মুখ ঢেকে নিয়েছে দেখা গেল।

কয়েকটা কণ্ঠের হাঁকডাক শোনা গেল ট্রলারে। ভারী একাধিক জোড়া পায়ের শব্দের সাথে দুলছে ওটা।

ঘুম ভেঙে গেছে ওদের সবার। হড়োহড়ি পড়ে গেছে। আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বেসামাল হয়ে পড়েছে। সবাই এসে জড় হচ্ছে সামনের খোলা জায়গায়।

ওদের মধ্যে চাচার সহকারীও আছে। দেখার সাথে সাথে তাকে চিনতে পারল জ্যোতি। দুই কোমরে হাত রেখে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটা। পুরোপুরি বোকা বনে গেছে।

সবাই যে কমবেশি অবাক হয়েছে, টর্চওয়ালার প্রশ্নেই বোঝা গেল। ‘কি করে বেঁচে গেলে তোমরা? এখানে পৌঁছলে কি করে?’

কেউ জবাব দিল না।

‘কি জন্যে এসেছ?’

‘মত্স্যকন্যাকে নিয়ে যেতে,’ বিজ্ঞানী বলে উঠলেন গম্ভীর গলায়। ‘মোকারম, ভাল চাও তো ছেড়ে দাও ওটাকে।’

‘না ছাড়লে কি হবে?’ প্রশ্ন করল প্রথমজন। হেসে উঠল শব্দ করে। ‘অ্যাঁই, ওঁদের একটা ব্যবস্থা করো তোমরা। কষ্ট করে এতদূর এসেছে, একটু খাতির-যত্ন না করলে খারাপ দেখায়। যাও যাও!’

জ্যোতিরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ট্রলার থেকে একটা জ্বলন্ত হ্যারিকেন উড়ে এসে পড়ল ডিঙির ওপর। শুকনো কাঠে কেরোসিন ছিটকে পড়ল, পরমুহূর্তে দপ্ করে আগুন ধরে গেল।

ছড়িয়ে পড়ল দৈখতে দেখতে। পুরো ডিঙি গ্রাস করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল উজ্জ্বল, কমলা আগুন।

ত্রিশ

কেরোসিনের ছোঁয়া পেয়ে আগুন খুব তাড়াতাড়ি অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ল। লাফিয়ে উঠছে শিখা, রাতের নীলচে কালো আকাশের পটভূমিতে কমলা ও হলদে রঙের আগুনের সাথে কালো ধোঁয়া ভয়াবহ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

আঁতকে চোঁচিয়ে উঠল সামনের গলুইয়ে বসা উপম। আরেকটু হলে লাফিয়েই পড়ত পানিতে, সময়মত ধরে ফেললেন ডক্টর ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

ইসলাম।

‘খবরদার!’ চৈঁচিয়ে বললেন। ‘কেউ পানিতে নেমো না, ডুবে যাবে। পিছিয়ে এসো সবাই, জলদি!’

ভালমতই ধরে গেছে আগুন, চড়চড় করে শুকনো কাঠ পুড়ছে। ক্রমে শিখা আরও ওপরে উঠছে।

গায়ের শার্ট খুলে ফেললেন উপমের চাচা, ওটা পানিতে ভিজিয়ে আগুনের ওপর ঘন ঘন বাড়ি মারতে লাগলেন। ‘জামা খুলে ফেলো তোমরা সবাই!’ ব্যস্ত গলায় চৈঁচিয়ে বললেন। ‘জলদি! আগুন নেভাতে হবে!’

তাই করল ওরা। যে যার শার্ট পানিতে চুবিয়ে এখানে-সেখানে বাড়ি মারতে লেগে পড়ল। ভেজা কাপড়ের আঘাতের পর আঘাতে কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনের তেজ কমে এল।

এর মধ্যেও ট্রলারে মোকারমকে চৈঁচিয়ে উঠতে শোনা গেল। ‘জলদি চলো, এখান থেকে সরে পড়তে হবে এখনই।’

‘ওরা চলে যাচ্ছে!’ আঁতকে উঠল জ্যোতি। ‘ওরা—’ থেমে গেল আরেক চিন্তার স্তনে।

‘মৎস্যকন্যা!’ অনেকটা আতর্নাদের মত শোনালা একটা গলা। ‘মৎস্যকন্যা কোথায় গেল?’

জ্যোতি অবাক-নিম্মিয়ে ঘুরে তাকাল। যেখানে ওটা বাঁধা ছিল, সেদিকে তাকাল। নেই ওটা!

ঢিলাদড়ি পানিতে ভাসছে। মাথায় কিছু নেই।

মৎস্যকন্যা চলে গেছে! বন্ধুরা ছাড়িয়ে নিয়ে গেছে ওকে।

আনন্দে নাচতে ইচ্ছে হলো জ্যোতির। কিন্তু সুযোগ হলো না।

ওদিকে ট্রলারে নতুন করে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। বুঝে ফেলেছে ওরা কি ঘটেছে।

কেউ একজন ওপর থেকে ঝুঁকে খপ্পু করে জ্যোতির বাহু চেপে ধরল। ভীষণ শক্তি লোকটার গায়ে। ‘মৎস্যকন্যা কোথায়?’ চেষ্টা করে উঠল সে পাগলের মত। ‘ওটাকে কোথায় রেখেছ?’

হাত ছাড়াবার জন্যে জোরাজুরি শুরু করল ও। কিন্তু লাভ হলো না, বরং ব্যথা লাগছে। ‘আমি জানি না!’

‘নিশ্চয় জানো। কোথায় ওটা, জলদি বলো।’

বিজ্ঞানী রাগে কাঁপতে শুরু করেছেন। ‘ছেড়ে দাও ওকে! মৎস্যকন্যার ব্যাপারে ও কিছু জানে না!’

হঠাৎ সেই লাঠিটার ওপর চোখ পড়ল জ্যোতির। কেউ একজন প্রফেসরের মাথা সহ করে চালিয়েছিল ওটা। তবে লাগাতে পারেনি, শেষ সময়ে বসে পড়ে আঘাতটা এড়িয়ে গেছেন তিনি।

নিজেকে ছাড়াবার জন্যে মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করেছে জ্যোতি, কিন্তু সুবিধে করতে পারছে না। ওর সাহায্যে উপম এগিয়ে এল। লোকটার হাত ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করল।

ওদিকে আগুন আবার বাড়তে শুরু করেছে।

একত্রিশ

আরেক হাতে উপমকে ধরে ফেলল লোকটা, ছুঁড়ে মারল ডিঙির আরেক মাথায়। দড়াম করে আছড়ে পড়ল ও, ব্যথায় গুণ্ডিয়ে উঠল।

‘ছেড়ে দাও ওকে!’ জোতির এক হাত ধরে টানলেন বিজ্ঞানী। মোকারম হোসেনের দিকে কড়া চোখে তাকালেন। ‘তোমাকে আমি ছাড়ব না, বদমাশ! এ-জন্যে তোমাকে পস্তাতে হবে।’

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না মানুষটার মধ্যে। একভাবে দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে আগুন বেশ বেড়ে গেছে, চড়চড় শব্দে পুড়ছে ডিঙি।

‘রাজা, আগুন--!’ চৈঁচিয়ে বললেন মেরিন বয়োলজিস্ট। ‘জলদি আগুন নেভাও! জলদি করো, জলদি! উপম, বেশি লাগেনি তো?’

‘না,’ উঠে পড়ল ও, রাজার সাথে আগুন নেভাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জ্যোতিকে তখনও ছাড়েনি লোকটা। পেছন থেকে আরেকজন তার উদ্দেশে বলল, ‘ওটাকে পানিতে ফেলে দাও! ডুবে মরুক। সব

ক'টাকে ফেলে দাও, ডিঙি ডুবিয়ে দাও । ছাড়া যাবে না ওদের ।'

হাসি ফুটল লাঠিওয়ালার মুখে । 'সেই ভাল ।'

জ্যোতিকে ছেড়ে দিয়ে ডিঙিতে আসার জন্যে পা তুলেছিল,
হঠাৎ চৈচিয়ে উঠল ভয়ে । ট্রলার ভীষণভাবে দুলতে শুরু করায়
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে লোকটা । অবশ্য শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে
সামলে নিল । চেহারায় বিস্ময় ।

ট্রলার তখনও দুলছে । মনে হচ্ছে যেন বড় বড় ঢেউয়ের মধ্যে
পড়েছে । একটু পর দোল আরও বাড়ল, ক্রমে ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক
হয়ে উঠছে ব্যাপারটা । ডানে-বাঁয়ে দুলছে ট্রলার, দুলছে ।

ভয়ে চোখ বড় হয়ে উঠেছে লোকগুলোর । রেলিঙ আঁকড়ে ধরে
প্রাণপণে নিজেদের পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করছে ।

আতঙ্কে, বিস্ময়ে চৈচাচ্ছে ।

এদিকে ডিঙিতে ওরাও অবাক । বুঝতে পারছেন না কি ঘটছে ।
ট্রলার দুলছে, অথচ ডিঙি স্থির, ব্যাপারটা কি ভেবে পাচ্ছে না ।

চোখ টাঁদিতে তুলে দাঁড়িয়ে আছেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম ।
ঘনঘন ট্রলার আর পানির দিকে তাকাচ্ছেন ।

হরর ক্রাবের তিন সদস্যই বোকা বনে গেছে ।

আরও বাড়ছে দোল । আরও বাড়ছে । লোকগুলো অসহায়ের
মত রেলিঙ ধরে বুলে আছে ।

হঠাৎ ব্যাপারটা চোখে পড়ল জ্যোতির ।

মৎস্যকন্যা!

ওদের কাজ! ওরা দোলাচ্ছে ট্রলার!

চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ওটাকে । তীক্ষ্ণ গলায় শিসের মত

আওয়াজ করছে, ভীষণ উত্তেজিত সব কটা।

ব্যস্ত হয়ে পিছিয়ে এলেন ডক্টর ইসলাম, তাড়াতাড়ি ডিঙির এঞ্জিন চালু করলেন। ‘কাজ হয়ে গেছে!’ চেষ্টা করে উঠলেন। ‘চলো, সরে পড়ি আমরা। শয়তানগুলোর বিচার ওরাই করুক।’

ডিঙি ঘুরিয়ে নিলেন বিজ্ঞানী, ছুটলেন সেন্ট মার্টিনের দিকে।

পেছনে তাকিয়ে আছে সবাই। ট্রলারের দুলুনি আগের থেকে অনেকগুণ বেড়ে গেছে। যে কোন সময় তলিয়ে যাবে ওটা।

চারপাশের পানিতে নাচানাচি করছে একদল মৎস্যকন্যা, লেজ তুলে পানিতে ঘন ঘন বাড়ি মেরে আনন্দ প্রকাশ করছে।

‘ওকে ছাড়িয়ে নিয়েছে ওরা!’ উত্তেজিত গলায় জ্যোতি বলল।

‘মৎস্যকন্যাকে ছাড়িয়ে নিয়েছে সঙ্গিনীরা!’

হেসে উঠলেন ডক্টর ইসলাম। ‘তাই তো দেখছি।’

উপম ও রাজা নীরবে তাকিয়ে আছে সেদিকে। চেহারায়া বিস্ময়। মুখে কথা ফুটেছে না ওদের।

ডিঙি গন্তব্যের দিকে ছুটে চলেছে। আঁগুন পুরো নেভেনি, একটু একটু করে জ্বলছে এখনও। তবে বাতাসের চাপে শিখা খাড়া হতে পারছে না, ঝুঁকে আছে।

ভেজা শার্ট দিয়ে কয়েক বাড়ি মেরে নিভিয়ে ফেলল উপম। একটু পর ট্রলারটাকে আর দেখা গেল না। আঁধারের জন্যে? ভাবল জ্যোতি। নাকি ডুবে গেছে?

ডুবিয়ে দিয়েছে ওরা?

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন ডক্টর ইসলাম। ‘বাপ্‌রে! আজ রাতের কথা চিরদিন মনে থাকবে আমার।’

‘আমারও,’ উপম বলে উঠল।

রাজা কিছু বলল না। নীরবে গাম চিবিয়ে চলেছে। জ্যোতি তাকিয়ে আছে ট্রলারটা যেখানে ছিল, সেদিকে। মৎস্যকন্যার কথা ভাবছে। ওর সঙ্গিনীদের কথা ভাবছে।

ওর দিকে তাকিয়ে উপমের চাচা হাসলেন। ‘জ্যোতি, কাল আবার খুঁজে বের করব আমরা তোমার মৎস্যকন্যাকে। এখন আমরা জানি ওকে কোথায় পাওয়া যাবে।’

চোখে চোখে তাকাল তিন বন্ধু।

‘ওকে খুঁজে বের করে কি করবেন?’ প্রশ্ন করল ও।

‘কিছু না,’ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কি ভেবে বললেন না। শীগ করে সামনে মন দিলেন।

আকাশের দিকে তাকাল জ্যোতি। চাঁদ অনেক ঢলে পড়েছে, বেশি দেরি নেই ডুবে যেতে। একটু একটু ঠাণ্ডা লাগছে।

ভোর হবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

বত্রিশ

পরদিন।

সীগালের খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে আছে জ্যোতি, উপম আর রাজা। ভোরের দিকে সামান্য ঘুমিয়েছে ওরা।

চেহারা তাই ফোলা ফোলা সবার। চোখ লাল। মোকারম হোসেন নেই আজ। কে রাঁধবে, কি রাঁধবে, তাই নিয়ে গবেষণা করছে রাজা ও উপম।

‘দূর, বাদ দে রান্নাবান্না!’ বিরক্ত হয়ে উপম বলে উঠল একসময়। ‘খিদে পেলে দ্বীপের বাজারে গিয়ে খাবার কিনে আনব হোটেল থেকে।’

‘এতক্ষণে একটা বুদ্ধিমানের কথা বলেছিস,’ রাজা বলল। টপ করে মুখে একটা ছুঁড়ে দিল।

জ্যোতির সেদিকে মন নেই। অন্য কিছু ভাবছে ও। উপম ব্যাপারটা খেয়াল করল। ‘কি রে জ্যোতি, কি ভাবছিস তুই?’

‘ভাবছি মৎস্যকন্যা আর লেঙনে ফিরে এসেছে কিনা।’

রাজা বলল, ‘এসেছে নিশ্চয়। ওখানেই তো ওর বাসা। কেন,

যাবি নাকি দেখে আসতে?’

জবাব দিল না ও। ‘কেউ যদি তোদের অনেক টাকা দেয়,
তোরা কি সাহায্য করবি তাকে ওদের ধরতে?’

‘কক্ষনো না,’ জোরে জোরে মাথা দোলাল উপম।

রাজাও মাথা নাড়ল। ‘আমিও না।’

‘আমি ভাবছি—’ থেমে গেল প্রধান।

‘কি?’ উপম ঘুরে তাকাল।

‘তোর চাচার কথা। আজ আবার মৎস্যকন্যাকে খুঁজে বের
করবেন বলেছেন উনি। কেন, তাই ভাবছি।’

‘নিশ্চয় কোন কারণ আছে,’ রাজা বলল। ‘শুধু শুধু—’ একটা
এঞ্জিনের আওয়াজ কানে যেতে থেমে গেল মাঝপথে। ‘কে এল
আবার?’

একযোগে ঘুরে তাকাল ওরা।

একটা ট্রলার। এদিকেই আসছে। গতি একটু একটু করে বাড়ছে
ওটার। বেশ কাছে এসে পড়েছে। চোখ কুঁচকে ওটার পাশে
লাগানো বোর্ডটা পড়ল জ্যোতির। ওটায় লেখা আছে:

সোনার বাংলা সার্কাস

চট্টগ্রাম

‘আরে!’ উপম বলে উঠল। ‘ওটা তো সেই সার্কাস কোম্পানির
ট্রলার। ইলিয়াস সাহেব না কি যেন—’

হ্যাঁ, তাই তো! জ্যোতি ভাবল। মনে পড়ল লোকটা ক’দিন পর
মৎস্যকন্যার ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসবে বলে গিয়েছিল।

ওই তো সামনের খোলা পাটাতনে এসে দাঁড়িয়েছে সে আর

তার স্ত্রী। ওদের দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটিমিটি।

জ্যোতি শঙ্কিত হয়ে উঠল। কি বলবেন ওদের বিজ্ঞানী?
বলবেন, মৎস্যকন্যা আছে? তিনি ওদের খোঁজ পেয়েছেন?

ওরা আজ টাকা দিলে নিয়ে নেবেন তিনি? টাকার বিনিময়ে
মৎস্যকন্যাদের একটা ধরে তুলে দেবেন ওদের হাতে?

ট্রলারের এঞ্জিনের আওয়াজ কমতে কমতে থেমে গেল
একসময়। দুলতে দুলতে সীগালের গায়ের সাথে ভিড়ল ওটা। দড়ি
দিয়ে বাঁধা হলো ওটাকে সীগালের সাথে। একটু পর এটায় চলে এল
ইলিয়াস মোল্লা ও তার স্ত্রী। হাসছে।

‘প্রফেসর সাহেব কোথায়?’ প্রশ্ন করল লোকটা।

ওরা জবাব দেয়ার আগেই ডেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, তাদের
দু’জনকে দেখে হাসলেন, ‘আসুন।’

‘কেমন আছেন, স্যার?’ সার্কাস মালিক প্রশ্ন করল।

‘ভাল। আপনারা?’

‘ভাল আছি। কয়েকদিন থেকে আসব আসব ভাবছিলাম, কিন্তু
সময় করে উঠতে পারিনি।’

‘জেলেদের মুখে শুনলাম মৎস্যকন্যাকে ধরেছেন আপনি,’
মহিলা বলল এবার হাসিমুখে। ‘তাই একবারে টাকা পয়সা নিয়েই
এলাম।’

‘হ্যাঁ, স্যার,’ হাতের কালো ব্যাগটা দেখাল মালিক। ‘আজই
ওটাকে নিয়ে যেতে চাই আমি।’

‘একেবারে তৈরি হয়েই এসেছেন?’ বিব্রত দেখাল বিজ্ঞানীকে।

‘জি, স্যার। শুধু নিয়ে গেলেই তো হবে না, ওটার থাকার

উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্যে ঠিক করেছি বড় একটা পুকুরই কাটাব। কি বলেন, স্যার, ভাল হবে না?’

মাথা ঝাঁকালেন ডক্টর ইসলাম। ‘কিন্তু—’

‘আবার “কিন্তু” কিসের?’ লোকটা বলল। ‘ওয়াদামত টাকা নিয়েই এসেছি আমরা।’ ব্যাগ থেকে টাকা বের করে বাড়িয়ে ধরল সে। ‘এই নিন, শুনে দেখুন। পুরো পঞ্চাশ হাজার।’

একবার টাকা, আরেকবার উপমের চাচাকে দেখতে লাগল জ্যোতি। কি করবেন এখন উনি? নিয়ে নেবেন ওগুলো?

নাকি—!

তেরিশ

‘টাকা রেখে দিন,’ বললেন তিনি।

লোকটা অবাক হয়ে গেল। ‘কেন, স্যার?’

‘অনর্থক টাকা কেন দেবেন?’

‘অনর্থক মানে! আপনি মৎস্যকন্যা ধরে দিলে যে টাকা দেয়ার কথা ছিল, এ-তো সেই টাকা, স্যার!’

মহিলার মুখে হাসি নেই এখন। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে।

জ্যোতিও অবাক । শুধু অবাক নয়, মহাঅবাক । চাচা কি করতে চলেছেন বুঝে উঠতে পারছে না । পারছে না উপম-রাজাও ।

মাথা দোলালেন ডক্টর ইসলাম । ‘সে আমি বুঝতে পারছি । কিন্তু আসল জিনিসেরই যেখানে খোঁজ নেই—’

‘খোঁজ নেই!’ কোনরকমে বলল লোকটা ।

‘না ।’

‘বুঝলাম না, স্যার!’

‘আপনি কার মুখে শুনে এসে আমাকে আবোল-তাবোল এক খবর দিয়ে গেলেন, কে জানে! গত কয়েকদিন নিজের কাজ ফেলে পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খুঁজে সময়ই নষ্ট করলাম শুধু । অনর্থক সময় আর শ্রম নষ্ট করলাম । মৎস্যকন্যার লেজের দেখাও পেলাম না ।’

‘তার মানে!’ হাঁ হয়ে গেল ইলিয়াস মোল্লা ।

‘তার মানে সেদিন আমি যা বলেছি, সেটাই ঠিক । ওসব মৎস্যকন্যা আসলেই রূপকথায় আছে, বাস্তবে নেই ।’

বিজ্ঞানীর মিথ্যে বলার কায়দা দেখে ওদিকে চোখ আলু হয়ে উঠেছে তিনবন্ধুর । হাঁ করে তাঁকে দেখছে ।

‘বাস্তবে নেই!’ বিড়বিড় করে উঠল লোকটা । ‘কি বলছেন আপনি?’

‘ঠিকই বলছি ।’

‘কিন্তু ওরা—জেলেরা যে বলল আছে?’

মহিলা এক পা এগোল । ‘আপনি দু’দিন আগে ওটাকে ধরেছেন, আমরা তাও শুনেছি, প্রফেসর সাহেব ।’

মাথা দুলিয়ে হাসলেন তিনি। ‘বুঝুন তাহলে অবস্থা! জিনিসটা কেমন চোখেই দেখিনি কোনদিন, অথচ ওরা বলছে ধরেছি। কি আশ্চর্য কথা! ওরা দেখছি দিনকে রাত করে ফেলতে পারে।’

ধাক্কা সামলে সহজ হতে অনেকক্ষণ লাগল ইলিয়াস মোল্লার।
‘ও—তা-তাহলে ওরা ঠিক বলেনি?’

‘নিশ্চয়!’ জোর দিয়ে বললেন তিনি। ‘বাজে কথা বলেছে ওরা। শুধু শুধু সময় নষ্ট করেছে আপনার—আমার, সবার।’

‘যাহ্!’ বোকার মত স্ত্রীর দিকে তাকাল সার্কাসের মালিক।
কালো হয়ে গেছে চেহারা। ‘তাহলে—সব মিথ্যে!’

‘ডাঁহা মিথ্যে!’

‘কিন্তু—’

‘দেখুন, ইলিয়াস সাহেব। আমার বর্তমান গবেষণার জন্যে ভার্টিটি যে টাকা বরাদ্দ দিয়েছিল, তা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। এই পঞ্চাশ হাজার পেলে আমারই উপকার হত, সেই জন্যেই খুব জোর দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু কি আর করা! যা নেই, তা কি করে জোগাড় করব আমি?’

একটু থেমে আবার বললেন তিনি, ‘আমি সেদিনই বলেছি, যারা এসব গল্প ছড়িয়ে বেড়ায় তারা গণ্ডমূর্খ। অশিক্ষিত। ভীষণরকম কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। দেখেছে মাছ, অথচ বলে বেড়ায় মৎস্যকন্যা। অথবা হয়তো ডলফিন দেখেছে, কি জানি!’ শ্লাগ করলেন। ‘অবশ্য এর ফলে কষ্ট আমার হয়েছে ঠিকই, তবে কাজও কিছুটা হয়েছে।’

কিছু বলল না লোকটা বা তার স্ত্রী। তাকিয়ে আছে।

‘সেটা হলো, এ-ব্যাপারে আমার আগের বিশ্বাস আরও দৃঢ়
ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

হয়েছে। মৎস্যকন্যা বলে আসলেই কিছু নেই। সব বানানো গল্প।’

হতাশায় ছেয়ে গেল স্বামী-স্ত্রীর চেহারা। ‘আপনি পুরোপুরি নিশ্চিত তাহলে?’ মহিলা বলল।

‘একশোবার!’ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন উপমের চাচা। ‘সাগরের নিচে গবেষণার জন্যে আমার যে সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে, তা সবই লেটেস্ট মডেলের। অত্যাধুনিক। ওগুলোর চোখ ফাঁকি দিয়ে চলার ক্ষমতা কোন প্রাণীর নেই।’

মাথা চুলকাল সাকার্সের মালিক। ‘সে আমরা শুনেছি, স্যার। আপনার গবেষণা সম্পর্কেও খবরের কাগজে অনেক কিছুই পড়েছি। সেই জন্যেই তো আপনার কাছেই ছুটে এসেছিলাম।’

‘সেজন্যে ধন্যবাদ আপনাদের,’ তার কাঁধে এক হাত রাখলেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম। ‘কিন্তু আসলে সোনার হরিণের পেছনে ছুটছেন আপনি, ইলিয়াস সাহেব। ওসব চিন্তা বাদ দিন, যা নিয়ে আছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। একটা কথা জানবেন, যে অল্পে সন্তুষ্ট থাকে, তাকে কোনদিন অভাবে পড়তে হয় না। আর যে পাহাড় সমান টাকার মালিক হয়েও আরও টাকা চায়, তার অভাব কোনদিনও যায় না। এ আসলে মনের ব্যাপার।’

অনেকক্ষণ পর জবাব দিল লোকটা। চিন্তিত গলায় বলল, ‘আপনি ঠিকই বলেছেন, স্যার। আজ থেকে আপনার পরামর্শই মেনে চলব আমি।’ একটু সময় চুপ থেকে বলল, ‘আপনাকে কষ্ট দিলাম শুধু।’

‘না না,’ বললেন বিজ্ঞানী। ‘কোন কষ্ট হয়নি আমার, বরং লাভ হয়েছে। আমার আগের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে, বললাম না?’

বিদায় নিয়ে চলে গেল ইলিয়াস মোল্লা । ছোট হতে হতে এক সময় দিগন্তে মিলিয়ে গেল তার টুলার ।

চৌত্রিশ

জ্যোতির দিকে তাকিয়ে হাসলেন ডক্টর নেয়ামুল ইসলাম । ‘খিদে পেয়েছে?’

উত্তর দিল না ও । লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে চেহারা । মানুষটাকে সেদিন লোভী ইত্যাদি অনেক আজেবাজে কথা বলেছিল, সেসব মনে পড়ছে । অথচ মানুষটা নির্লোভ, আজ তা প্রমাণ হয়ে গেল ।

‘উপম! রাজা! খিদে পায়নি ভোমাদের?’

নীরবে মাথা ওপর-নিচ করল ওরা ।

‘চলো তাহলে বাজার থেকে কিছু কিনে আনা যাক । খেয়েদেয়ে মৎস্যকন্যারা সবাই ফিরেছে কিনা দেখে এসো গিয়ে ।’ হাসলেন তিনি । ‘কি জ্যোতি, যাবে না?’

দ্রুত মাথা দোলাল ও—যাবে । একই কথা ভাবছিল জ্যোতি ।

কাছে এসে ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন । ‘আমি জানি তুমি কি ভয়ানক দুঃস্থ

‘ভাবছ। ভুলে যাও ওসব। রাগের মাথায় মানুষ অনেক কিছুই বলে, সেসব মনে রাখি না আমি। এখন থেকে তোমরাও সেই প্র্যাকটিস করবে, কেমন?’

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ও। ‘জি।’

‘এখানে আমরা কি দেখেছি, কাউকে তা বলব না কখনও, ঠিক আছে?’

জ্যোতি নীরবে মাথা দোলাল।

উপম মাথা দোলাল নীরবে।

রাজাও দোলাল, তবে জাবর কাটতে কাটতে।

বাজার থেকে ফিরে খেতে খেতে বেশ বেলা হয়ে গেল। অসময় বলে রাজা বা উপম, কেউই আগ্রহ দেখাল না পানিতে নামার। রাতে ঘুম হয়নি কারও, পেট ভরতেই ঘুমে চোখ লেগে আসতে চাইছে দেখে শুয়ে পড়ল ওরা।

বিজ্ঞানীও বিশ্রাম নিতে গেলেন।

তাই বলে জ্যোতি পিছাল না। তৈরি হয়ে একাই নামল। ধীর গতিতে সাঁতরে লেঙনের দিকে চলল ও। রোদ লেগে চিক্‌চিক্‌ করছে সাগরের নীল পানি।

লেঙনে পৌঁছে ডুব দিল জ্যোতি। চারদিকে চোখ বোলাতে লাগল।

মৎস্যকন্যা! কোথায় তুমি? মনে মনে বলল।

আরও এগোল ও। ফায়ার কোরালের রীফ সাবধানে পেরিয়ে এসে আবার এদিক-ওদিক তাকাল।

মৎস্যকন্যা! তুমি কোথায়?

আচমকা পায়ে সুড়সুড়ি লেগে উঠল। ঝট করে ঘুরল জ্যোতি।
কই, না! কিছু নেই তো! তাহলে কে—!

উদ্ভিদ? লতা?

না অন্যকিছু?

কিছুই তো নেই।

আবার এগোল প্রধান। কয়েক গজ যেতে না যেতে আবার
সুড়সুড়ি দিল কে যেন। এবার একটু জোরে।

কে রে! থামল জ্যোতি।

ধারেকাছের উদ্ভিদের ঝোপ, রীফের ফোকরের দিকে তাকাল
চোখ কঁচকে। কিছুই চোখে পড়ল না।

হাসি ফুটল ওর মুখে। এ-নিশ্চয় দুট্ট মৎস্যকন্যার কাজ। ওর
সাথে মজা করছে। ঠিক তাই। ওটা ভারি দুট্ট।

ভাবতে ভাবতেই আবার টান।

এবার তৈরি ছিল জ্যোতি, খপ্ করে হাত বাড়াল। নরম কিছু
ধরা পড়ল মুঠোয়। নিচে তাকাল ও। একটা হাত।

যা ভেবেছিল ও।

এক উদ্ভিদের ঝোপের আড়াল থেকে হাত বাড়িয়েছিল
মৎস্যকন্যা। ধরা পড়ে ফিক করে হেসে উঠল।

‘ইইইইইইই!’ আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল একমাথা সোনালি
চুল আর গাঢ় সবুজ লেজ দুলিয়ে।

কি অপূর্ব হাসি! জ্যোতি ভাবল।

হয়তো ওটার ডাক শুনেই আরও কয়েকটা মৎস্যকন্যা ছুটে

এল । ছোট-বড় নানান আকারের । তারপর আরও কয়েকটা ।

দেখতে দেখতে লেগুন ভরে গেল ডজন ডজন মৎস্যকন্যায় ।

ওকে গোল হয়ে ঘিরে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল ওরা,
গান গাইছে নিজেদের বিচিত্র ভাষায় ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল জ্যোতি ।

মনে হলো পুরো সাগর ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে বুঝি ।

হাসছে খল্খল করে ।

প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি আর সেদিনের অদ্ভুত সেই হাসি কখনও
ভুলবে না জ্যোতি ।



হরর ক্লাব

ভয়ানক দুঃস্বপ্ন

টিপু কিবরিয়া

পাঠক, সাবধান!

ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!

সেন্ট মার্টিন দ্বীপে সামুদ্রিক মাছ ও উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণারত

মেরিন বায়োলজিস্ট চাচা ওখানে বেড়াতে

যাওয়ার আহ্বান জানানেন ভাইপো উপমকে।

আর পায় কে!

উপমের সাথে জুটে গেল জ্যোতি ও রাজা।

ছুটল। তারপর—

গুরু হলো একের পর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা।

দুঃস্বপ্ন আর দুঃস্বপ্ন।

হাঙরের মুখে পড়ল জ্যোতি।

জানে মৃত্যু সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কিন্তু—হঠাৎ, ওটা কি!



সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

High Quality Aahor Arsalan Scan

scan with
canon



Aahor Arsalan

**ALL OUR BOOKS ARE HQ IN QUALITY
LATEST, RARE & TOP COLLECTION**

Visit Us Now

WWW.BANGLAPDE.NET